KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 82 বিধান পল্লী, যাদবপুর, কল-৩২ (21) সি/2 আর-২২৬-ই ৩০৫ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কল-৫৪
Collection : KLMLGK	Publisher : অরুণ বসু
Title : অন্তরতম	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 18 19 20 21	Year of Publication : Sep 1983 May 1985 May 1986 Feb 1989 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অরুণ বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অজ্ঞাতবাস

অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞা-
প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের কাগজ প্রথাবিরুদ্ধ
কবিতা ও কবিতা প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের
অজ্ঞাতবাস সংকলন: ২০, মে '৮৬ অজ্ঞাতবাস সংকলন ২০, মে '৮৬

সূচি অজ্ঞাতবাস সংকলন ২০, মে, ১৯৮৬

পদ্য : দেবদাস আচার্য অপারতা লাহিড়ী তাপসরায় তরুণ গোস্বামী শঙ্করনাথ চক্রবর্তী বংশীধর কুমার গৌতম হেঁস সঞ্জীব প্রামাণিক চন্দন দত্ত অরুণ সাধুখাঁ ঊর্মিলা চক্রবর্তী মুকুল চট্টোপাধ্যায় বিকাশ সরকার কালীকৃষ্ণ গুহ। গদ্য : প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ পদ্য : জহর সেন মজুমদার। পদ্য : শেখর মৈত্র পবিত্র বসু ভাস্কর চক্রবর্তী নির্মল হালদার অমিতাভ মৈত্র অনুভব সরকার নিত্য মালাকার মৃণালেন্দু দাস। গদ্য : পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। পুনর্মুদ্রণ : নির্বাচিত পদ্যগুচ্ছ অরণি বসু। গদ্য : সুজিত সরকার। পদ্য : নীলকান্ত রায় সুকুমার ঘোষ গৌতম বসু অভিরূপ সরকার সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় সগর মৈত্র তিমির দেব সমীরণ রায় সুতপা সেনগুপ্ত অরুণ বসু। প্রচ্ছদ : রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। অজ্ঞাতবাসের পক্ষে প্রকাশক অরুণ বসু ৪২ বিধানপল্লী যাদবপুর কলকাতা-৭০০০৩২ থেকে প্রকাশিত এবং অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত। দাম : চার টাকা।

প্রসঙ্গ, অজ্ঞাতবাস ২০

গত ২৫ বৈশাখ বেরিয়েছিলো ১৯ নম্বর সংখ্যা। তারপর, একবছরের ব্যবধানে, এ-বারেও ২৫ বৈশাখ বের হ'লো অজ্ঞাতবাস ২০ নম্বর সংখ্যাটি।
একটি সত্যিকার লিট্‌ল ম্যাগাজিন বের করতে অর্থ ও সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয় গাধার মতো অমানুষিক পরিশ্রম।
যে-কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এ-এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা।

কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধ'রে একটা ছোট কাগজ চলছে, ভাবলে চমকে উঠতে হয় বিস্ময়ে। তবু অজ্ঞাতবাস কোন্ অজ্ঞাতরহস্যে এবং কেন এখনো আমরা প্রকাশ ক'রে চলেছি, আমি জানিনা।

প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের পর-পরই ভাবি, এই শেষ। এতো পরিশ্রম, এতো সময়, এত বিপুল অর্থ এবং সর্বোপরি স্বভাবসিদ্ধ এতো ধৈর্যও আর ইদানীং আমার নেই, আমি টের পেতে শুরু করেছি।

আমরা হিশেব ক'রে দেখেছি, এই সংখ্যার মোট খরচ প্রায় আড়াই হাজার টাকা। একটি উন্নতশীল সমাজে যে-কোনো নিম্নবিত্ত পরিবারের কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার দায়মুক্ত হওয়ার পক্ষে এই অর্থ অনেকখানি। তবু, এইভাবেই ২১ ২২ এবং ২৫-ও হয়তো কোনো একদিন বেরোবে এবং বন্ধুও হ'য়ে যাবে যথারীতি। এটাই কনভেনশন্। এইভাবেই তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের সব ভাষারই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একই দুরবস্থা।

এই সংখ্যায় ৩২ জন কবির ৫৭টি পদ্য এবং ৩ জনের ৩টি দুর্দান্ত গদ্য স্থান পেয়েছে। এর বাইরে জহর সেন মজুমদারের ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি দীর্ঘ পদ্য যা আমাদের প্রথম পাঠেই মুগ্ধ ও চমকিত করে। এ-ছাড়াও অরুণ বসুর ১৯৬৮-'৭৮ সময়-সীমার মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত লেখা থেকে ১১টি পদ্যের একটি নির্বাচিত গুচ্ছ পুনর্মুদ্রিত হলো যেহেতু কবিতা পাঠকদের দাবী সত্ত্বেও অরুণির কোনো পদ্যের বই এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এরকম অনেকেরই হয়নি। যেমন হেমন্ত আঢ্য।

আমরা হেমন্তর সমস্ত প্রকাশিত পদ্যের একটি নির্বাচিত গুচ্ছ পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব ও'কে দিয়েছিলাম। কিন্তু হেমন্ত নিজের পদ্য বিষয়ে অত্যন্ত নির্মম, খুঁতখুঁতে, লাজুক এবং স্পর্শকাতর। ফলে, ও'কে আমরা রাজী করাতে পারিনি। সুখের কথা, আগামী সংখ্যার জন্য ও শেষ পর্যন্ত পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ শ্রীযুক্তপাঁচু রায় লিখিত রমেশ চন্দ্র সেনেরওপর একটি ছোট গদ্য এবং ওই সঙ্গে রমেশ চন্দ্র সেনের একটি গল্প পুনর্মুদ্রণের সংকল্প বর্তমান সংকলন থেকে আমাদের তুলে নিতে হ'লো আর্থিক সামর্থের অভাবে।

পরবর্তী সংখ্যায় নিশ্চয়ই আমরা রমেশ চন্দ্র সেনকে যুক্ত করছি। এবং অসীম রায়ের গল্প ও তাঁর লেখালেখি বিষয়ে গদ্য ছাপার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। যদি আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে হতাশা আমাদের গ্রাস না-করে।

—অরুণ বসু

জীবনানন্দের পর বাংলা কবিতার অন্য একটি দুয়ার

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর
ব্রহ্ম ও প্রকৃতির মর্ম

কবিতা পড়ার যোগ্যতা বা সামর্থ্য না-থাকলে পড়বেন না

With
Best Compliments
From

G. S. S.

Katwa, Burdwan

দেবদাস আচার্য

বেঞ্জামিন মোলায়েজ বলেন

খাদ্য আর আত্মরক্ষা কবিতার চেয়ে বেশি জরুরী,
আমাদের বেঁচে থাকার শিল্প এখান থেকেই শুরু হয়েছে।
জন্তু ও দেবতাদের মধ্যের যে প্রাণী-জগৎ
তাদের মুখ থেকে আমি এ কথা শুনেছি ;
এবং শুনেছি অনেক প্রার্থনা, দেখেছি অনেক শ্রম
ঈশ্বর কখনো মানুষের সন্ধান করেনি
মানুষই জন্তু কিম্বা পাথরকে ঈশ্বর বানিয়েছে
শস্য এবং বৃক্ষকেও
কেবল খাদ্য এবং আত্ম-রক্ষার জন্যেই—
এ কথা আমি আদিম যুগ থেকে শুনে আসছি।

আধুনিকতম মানুষের মেধার গর্ব ও রসবোধ
আমি ভালো করে নিঙড়ে দেখেছি,
তাদের কবিতা ও গানের আধারে
পরতের পর পরত সাজানো রয়েছে
ঐ দূরের ফেলে আসা অন্ধকার
ভয় ও আস্পৃহা, উল্লাস ও বিষাদ
খাদ্য ও স্বাধিকারের জন্যে হাড়া-হাড়ি সংগ্রাম।

এমন নয় যে আমাদের জীবন কবিতার মতো,
আমরা জীবনকে বিশাল স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে গিয়েছি।
এমন নয় যে আমরা ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রাণী,
আমরা বরাবর কল্পিত ঈশ্বরের মতো হতে চেয়েছি।
এমন নয় যে এই মহান পৃথিবী আমাদের জন্যে চিন্তিত,
আমরা আমাদের প্রয়োজনে তাকে ভাঙা-গড়া করেছি।
ঐ দূরের নক্ষত্রের দিকেও আমরা তাকিয়েছি
ঐ গভীর সমুদ্রের দিকেও, এবং
অবিশ্রাম আমরা অনুসন্ধান করেছি মানুষের সৌভাগ্য।

ক্রমশই আমাদের বিভ্রম দূর হচ্ছে, খিদে
যা আমাদের জাগ্রত করেছে,—বিচ্ছিন্ন, একাকী পরিতৃপ্তির জন্যে নয়
যা আমাদের জাগ্রত করেছে ও একত্রিত করেছে,
যা আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ একাত্মতার কথা ভাবিয়েছে
যাকে আমরা মানবতা বলেছি, সেই খিদে
যা আমাদের বিশ্বকেই রূপান্তরিত করার কথা বলেছে

প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি, যে আরাম
যে আত্ম-রক্ষার কথা ভাবি, যে স্বাধিকার ভোগ করতে চাই
তার ভিতরের আদিম জৈবতার অভিজ্ঞতাকেই
এক স্থায়ী কাব্য-প্রণালীর মধ্যে আমরা ধারণ করি,
যার মধ্যে আমাদের মহৎ আকাঙ্ক্ষার সব কিছুই ধৃত হয়,
আমাদের স্বপ্নের সব কিছুই ব্যঞ্জনা লাভ করে,
আমাদের জাগরণ আমরা অনুভব করতে পারি,
এবং আমরা ভাবি আমাদের মহৎ খিদের কথা,—
আরো বড় আত্মরক্ষার কথাই, বর্ণহীন, শ্রেণীহীন।

যখন আমরা আর বিচ্ছিন্ন ও আদিম থাকিনি

তখনই এসব কথা ভেবেছি, ভেবেছি
আমাদের খিদেও রূপান্তরিত হচ্ছে, বুঝতে পেরেছি
আমাদের আরো সুশৃংখল জীবনবোধের ভিতরে যেতে হবে ;
সামগ্রিক আদিমতা থেকে আরো বহু পূর্ণতার দিকেই
আমাদের সমবেত গান ছুঁড়ে দিয়েছি, আর
আমাদের গতিপথ আলোকিত করতে চেয়েছি।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্যুতি ও চেতনা,
যা আমরা দীর্ঘকাল ধরে বহু অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে গড়ে তুলেছি
আরো বিশাল ও মহৎ খিদেকে তৃপ্ত করার জন্যেই।
খিদে আর আত্মরক্ষার ইচ্ছে আমাদের বরাবর জাগ্রত করেছে, আর
আমি জানি যে, এর মধ্যে বিশেষ কোনো রহস্যই নেই
বিশেষ কোনো ইন্দ্রজাল বা অপার্থিব বিভ্রমও নেই
এমনকি ঈশ্বরও নেই,
শুধু ভালোবাসা আছে
যা আমরা সব রকম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংহত করেছি।

আমার শরীরের আলো আজ তোমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছ,
যা তোমাদের ওপর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে,
এক সুন্দর সকালে আমাকে তোমরা দেখবে
মানবজাতির এক মহৎ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমি রয়েছি,—
এক কালো কবি, এই আমি, বেঞ্জামিন মোলায়েজ
ফাঁসির দড়ি গলায় পরে একথা বলছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য বলেন

আমি রাজা বিক্রমাদিত্য, ফের উঠে দাঁড়িয়েছি, এক স্বপ্নের ভিতর থেকে
এমন একটা সুন্দর দেশের মধ্যে দিয়ে আমি হাঁটলাম, যার কথা চিরদিন
আমার মনে থাকবে
আগামী জন্মেও আমার মনে থাকবে
এবং অনন্তকাল আমার মনে থাকবে
আমি জানিনা কিভাবে পূর্ণ হবে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা

এই মধু ও গম, ধানের শিষ হাতে
এই লাঙলের ফলা হাতে
প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে আমি বড়ো হয়েছি বলে মনে হয়
আর মনে হয় অনেক উঁচু ও বিশাল হয়ে থাকব আমি, বহুকাল, আর
আমার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বড়ো হয়ে উঠবে, রৌদ্রে, বাতাসে, এই বহু বর্ণময় দেশে
কাউকেই আমি অভিশাপ দিইনি
কাউকেই আমি ভয় দেখাইনি, বা হৃদয় থেকে ঘৃণা করিনি
কেবল বিষাদ ও শুদ্ধতায় আমার গান ছিন্ন হয়েছে, মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝেই
আমি ভেবেছি আমার যাদু ও এই বত্রিশ সিংহাসনের হিতাকাঙ্ক্ষার কথাও।
আমার গান আমি বহুদূর থেকে শুনতে পাই
আমার আলো আমি বহুদূর থেকে দেখতে পাই
এবং আমার সঙ্গে দুলে ওঠে সব কিছুই,
দুলে ওঠে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র,
দুলে ওঠে মানুষের অনুপ্রেরণাও।
এক শান্ত প্রবাহ আমি অনেক উঁচু থেকে লক্ষ্য করি
এবং তার মধ্যে আমি বিচরণ করি, ধূলিকণার মতো
জেগে উঠি কোনো সুদূর প্রজন্মে, পরিবর্তন ও নতুন গঠনের মধ্যে,
আর এই অসীমতা
আমাকে যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস ও গর্বের মধ্যে রেখে দেয়।
জেনো, আমার বিপন্নতা আসলে বিশ্বেরই বিপন্নতা
আমার আত্মার কষ্ট আসলে তোমাদেরই কষ্টের অনুরণনে তৈরী হয়—
তোমাদের শান্তির কথাই আমি কেবল ভাবতে পারি, ও তা পেরেছি
ঐ, তোমাদের জন্যে নির্মিত হয়েছে বত্রিশ সিংহাসন।
বিশ্বাস করিনি যে হিংসার চেয়ে বড়ো কিছু আর আমাদের নেই,
বিশ্বাস করিনি যে শাসনেই কেবল তোমরা আমার অনুগত থাকবে ও
ভালোবাসা পাবে,
এই দেখ আমার সবুজ, সুবিস্তৃত সবুজ
এই দেখ আমার নীল, তোমাদের এই চমৎকার দেশের আকাশ ও সমুদ্রকে
যা দিয়েছি
আমি তোমাদের ভিতর থেকেই গড়ে উঠেছি, তোমাদের ভালোবাসা ও ইচ্ছার
ভিতর থেকে
তোমাদের দীর্ঘ দিনের শ্রম ও আকাঙ্ক্ষার ভিতর থেকে, আজ
তাই আমি যেখানেই দাঁড়িয়েছি, এক-একটি সুন্দর দৃশ্য নির্মাণ করতে পেরেছি
মুঠো থেকে আলো ছড়াতে পেরেছি
জেনো, যা কখনো ম্লান হবে না
জেনো, যা কখনো ধ্বংস হবে না।

এবং আরো জেনো যে পাপ ও পুণ্যের ওপর আমি উজ্জ্বল চোখের
দ্যুতি নিয়ে ভেসে থাকি

প্রত্যেকের হৃদয়ের স্পন্দন আমি বুঝতে পারি
যে দিকেই তাকাই সবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে
আমার প্রতি বিশ্বস্ত হও ও নিজেকে চিরে চিরে দেখ
প্রতিটি রক্তকণিকার মধ্যে তোমার সেই অসংখ্য জন্মান্তরকে দেখ, আর জেনো
আমি যা বলছি তা পরীক্ষার দ্বারা শুদ্ধ ও সত্য
কেননা তোমাদের ইচ্ছাতেই আমার হাত বহুদূর উঠেছিল একদিন
এবং আমি ছোটো একটি নক্ষত্র থেকে জল এনেছিলাম
একটি প্রাপ্তবয়স্ক তারা থেকে কিছু সৌর-শক্তি এনেছিলাম
এবং পলাতক একটি উল্কা থেকে কিছু আকরিক,
এসব তোমাদের জন্যই এনেছিলাম, তোমাদের সুখের জন্যেই,
পরমাণু চুল্লির মধ্যে তোমাদের মাথা ঢুকে যাক, তা আমি কখনোই চাইনি।
অন্যান্য অনেক পৃথিবীর খবরই আমি রাখি, তা তোমরা নিশ্চয় জানো
আমার বত্রিশ সিংহাসন, আমার যাদু তোমাদের ইচ্ছা দিয়েই তৈরী
অনেক উঁচু থেকে আমি পৃথিবীকে দেখি আর কয়েক হাজার পৃথিবীর খবর রাখি
তাদের খুব অসুবিধে হয় তোমাদের সাংকেতিক রশ্মিকণা বিশ্লেষণ করতে
অস্বাভাবিক মৃত্যু আর যুদ্ধাপরাধকে তারা বিশ্বাস করে না
এই নাও আমার শিখা, তোমাদের চেতনাকে আলোকিত কর
এবং তোমাদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত কর, তোমাদের বিজ্ঞানকে আলোকিত কর
একটুকরো হীরের লকেট, নীলাভ সবুজ পৃথিবী, টলমল করে, আমি খুব
উঁচু থেকে দেখি
তখন কোনো ভূগোল থাকে না, তখন কোনো রাষ্ট্র থাকে না, তখন কোনো
সার্বভৌমত্বও থাকে না
একটুকরো হীরের লকেট, আমার প্রেমিকার গলায় ঝুলে থাকে, আমি দেখি
আমি বুঝতে পারি তোমাদের নিঃশ্বাস, বুঝতে পারি তোমাদের উষ্ণতা,
বুঝতে পারি হৃদয়াবেগকেও
আমার প্রেমিকার সুন্দর মুখ তোমরা একদিন দেখতে পাবে, তিনি তোমাদের
দেখা দেবেন,
যদি তোমরা আরো বেশি স্নেহ-প্রবণ হও, যদি তোমরা দু'শ বছর যুদ্ধ ভুলে
থাকতে পারো,
তাহলে তিনি দেখা দেবেন ও তিনি তোমাদের প্রচুর দুধ এবং যব উপহার দেবেন
এবং আমি তোমাদের অনেক উঁচুতে তুলে ধরব, এবং তোমাদের আমি
পৃথিবীকেও দেখাব
তারপর তোমরা পৃথিবী ও নিজেদের সম্বন্ধে খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারবে
আর তোমরা ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্যেও আনন্দ ফিরে পাবে, সুখ ফিরে পাবে

তোমাদের শুক্রকীটগুলোও অতি উন্নতমানের হবে, ও তোমাদের স্ত্রীদের
জরায়ু পুষ্ট হবে
আমার প্রেমিকার কাছ থেকে তোমাদের স্ত্রীরা অনেক প্রেরণা ও উৎসাহ পাবেন
এবং তোমরা তোমাদের শরীর থেকে ক্লান্তি আর যুদ্ধের পোষাক
খুলে ফেলতে পারবে।
কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো আমার প্রেমিকার মুখ, ঐ উজ্জ্বলতা তোমাদের জন্যেই
বহমান নদী আর উষ্ণপ্রস্রবণে আমি থাকি, ঐ গতি তোমরাই আমাকে দিয়েছ
ভুলোনা, তোমাদের আমি সব সময়ই লক্ষ্য করছি, আর অপরাধীকে ক্ষমা করিনি
হিটলারকে আমি ঘরে ঢুকতে দিইনি, তাকে দরোজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি
আমি রাজা বিক্রমাদিত্য তোমাদের বিবেক ও শক্তি,
আমি তোমাদের এক বিশাল ও জাগ্রত ইতিহাস দিলাম
তাল ও বেতালকে দিলাম, আমার বাজু দিলাম, যাদুদণ্ডও দিলাম
আমার বত্রিশ সিংহাসনও তোমাদের দিলাম, দিলাম অসংখ্য জনপদ
আমি রাজা বিক্রমাদিত্য, তোমাদের সম্মানিত আত্মা
দেখ পরিবর্তনকে, আমাকে, তোমার নিজের বিশ্বাসকেই—
আমার মধ্যে নিজেকে স্থাপন করো ও পুনর্বিবেচনা করো,
এভাবেই তোমরা বড়ো হয়ে উঠবে, আর আমার সমান মাপের মানুষ হয়ে উঠবে।

অপাবৃতা লাহিড়ী

বৃষ্টির দিন

তার হাতে একটি ফুল ফুটছিল
আমার হাতে প'ড়ে হ'ল তিনটি
গন্ধ তার অবাক হ'য়ে চ'লে গেল
হারিয়ে গেল সহজ-হওয়া দিনটি

ফুলগুলি উড়িয়ে দিলাম বাতাসে
বাতাস তাকে হাঁটতে শেখালোনা
সেই ভুলেই কোথায় ভেসে গেল সে
গন্ধদের খুঁজতে গেল বুঝিবা

তাপস রায়

উত্তরপুরুষ

রাত্রির প্রকৃত মনীষা যদি বোঝ তবে আরও
পুরুষের মতো হয়ে উঠতে পারি, তবে তোমাকে

সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে আবার নতুন সৃষ্টি ক'রে
নিতে পারি, শোনাতে পারি আরো দূর ভবিষ্যতের

গল্প, যেখানে শুরু হবে আশ্চর্য সেই ভোর, আর
ছড়িয়ে যাবে আর এক প্রকৃত পুরুষের বীজ

তরুণ গোস্বামী

খুলে দাও দরজার খিল

মাঝে মাঝে সকলের মুখ মনে পড়ে যায়। পায়ের শব্দ জেগে ওঠে
আভূমি, ও চোখের মণির মতো গাঢ় নীল তরুণ আকাশ, এই মাঠ
চেনামুখ বসন্ত মিছিলে স্নেহাশিস ঠোঁটে নিয়ে আসে অবেলার হাওয়া
চক্রজাল মেঘেদের দেশে কে দেবে আমাকে আর দামী মুদ্রা, গোমেদ, প্রবাল
কিছুই চাইনা আর, শুধু চাই সূর্যের মতো সত্য প্রিয় ভালবাসা, সুখ
এবং অসুখ যা বলো সবটুকু মেনে চলে যাবো একা অনন্তে, অসীমে
তোমার পায়ের ধুলো গায়ে মেখে চলে যাবো। চলে যেতে চাই বহুদূর
কোন্ ঋক্ উচ্চারণে জাগাও পাথর-মাটি-বন-উপবন, মনীষার এ কোন্ মোহিণী
সকালের সোনা রোদে মুখ ধোয় বিশাল আকাশ, মাঠ, এই ধূসু পথ
সারাদিন খুঁজি পাণ্ডুলিপি, চৌকাঠ পেরিয়ে আসে প্রজাপতি, চিদানন্দ প্রেম
বসে আছি খোলা দরজায়। চোখের পাতায় ভাসে ঋতুবন্ধ মনীষার মুখ
আমি কি এভাবে থেকে যাবো ? অরণ্য বাজায় বাঁশী, অন্তরায় বিষাদের সুর···
ছন্দের কুহক মোহজাল, হৃদয়, হৃদয়, মারমুখী নদী পাড় ভেঙে নেমেছে এখানে
সীমান্তের পারে এ টিলায় এখন চেতনার লাশ দেখে ভয়ে ভয়ে উড়ে যায়
গঙ্গাফড়িং আর কৃষ্ণকাক, কাঁকর, কাঁকর কে মেশালো রক্তে, মাংসে, ঘুমে
তবে কি অন্তিম যাত্রা ? আশ্চর্য সময়, রূপরসগন্ধের দেশে যম, যমের শাসন
রোমকূপে রক্তের গভীরে নাচে ক্ষয়, রুদ্ধ আবেগ জাগো, খুলে দাও দরজার খিল।

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

শিবিরবিষয়ক : ২

আমাদের দুর্গ থেকে পোড়া শহরের মাথাগুলো দ্যাখা যায়
ওখানে বাতাসের খুপরিতে পার্লামেন্টের মিটিং বসেছে
সেখানে বেশ্যারা ছোট ভাঁড়ে চা ঠেলে এগিয়ে দ্যায়
তাদের দালালরা ছোট বোনের বিয়ের কথা ভাবে

বংশীধর কুমার

সময়

নারী বললো—প্রেম দাও
বন্ধু বললো—ভালোবাসা
শুধু একজনই চেয়ে বসলো সব
সে সময়

গৌতম হেঁস

দহন

নদীর বিস্তৃত জলে নোনাঘাম, শিকড়বাকড়
অজস্র চুমুর দাগ জেগে আছে পাটাতনে ইন্দ্রিয়প্রহৃত
যতদূর দৃষ্টি যায় সূর্যের প্লাবিত আলো অবলম্বহীন
যৌনপ্রহারের পর পড়ে আছে শব্দহীন নদীর গ্রীবায়

রূপালী বালুর তটে গান গায় কুয়াশায় ভোরের শিশির
কম্পিত শরীর তার নির্বসন অনন্তপ্রতিভা
সূর্যকে রেখেছে ঢেকে নীলিমায় শিকলে, কৌশলে

সমস্ত দিনের শেষে রক্তিম সন্ধ্যায় অন্ধকারে
পরিদৃশ্যমান চাঁদ
নদীর শরীরে স্বপ্ন একান্তে নিহিত
নদী কি লুটেছে সব—সৌরমণ্ডলের ডানা, প্রকৃতি, মাস্তুল
আরণ্যপাখির ডাক, শরবন, নিঃশব্দ দুপুর

দহনের চিহ্ন, স্মৃতি, সমুজ্জ্বল রক্তমাংসে, চোখের বিভায়।

পিকাশোর ছবি

স্বতঃস্ফূর্ত বাঁশি ও সংগীতে স্বচ্ছ আমোঘ উল্লাস
বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙ্গে গেলে যে'রকম স্থির নগ্ন সিগাল
উড়ে আসে আরণ্যস্তব্ধতায়, উজ্জীবিত রৌদ্রের গভীরে
সদ্যোত্থিত শরীরে উষার প্রাকৃত প্রাবল্য দেখে
ক্রূর হাসে, লাথি মারে বিকৃত-বালক
স্মিত মুখে কয়েকটি পাতিহাঁস শুধু
ভয়াবহ দীঘির ভেতর থেকে তুলে আনে লালনীল আলো
সমস্ত হৃদয় আজ আশ্চর্য পাথর
অমাবস্যার মতো ক্লান্ত শবরী—
নক্ষত্র আলোয় কোন দ্যুতি নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই
মিথুন ভাস্কর্যে নেই শিল্পিত প্রভাস
অশ্রুর বদলে তুমি তুলে নাও বিস্তৃত আকাশ
মর্ত্যের সমস্ত ফুল, ভ্রমরগুঞ্জনধ্বনি
পার্থিব যন্ত্রণা সব ঢেকে রাখ মৌনতায়, ভাটিয়ালী সুরের ভেতর
সচ্ছল শরীর চাই, মিথুন বাতাস
তুমি নিয়ে এস আজ অসহ্য দুপুরে, মধ্যরাতে
তুমি গাও তরল সংগীত
শিকড়ে শিকড়ে, জ্যোৎস্নার ভেতরে খেলা করে সবুজ প্রান্তর
সদ্যস্নাত ! নিষ্পেষিত তুমি
স্মিত নগ্ন দুই উরু ঘিরে বীজকম্প্র
দুই চোখে অরণ্য তিমির
পিকাশোর ছবি হ'য়ে জেগে আছো আপাত-পয়ারে।

সঞ্জীব প্রামাণিক

সহমরণ

পার্কে, শালের বনে, কেটেছে এগারো বছর।
মনে নেই ? তুমি ছিলে ঈশ্বর প্রেমিক।
আমার গোপন সব পাথুরে লিঙ্গের মতো ভালোবেসেছিলে।

তবে কেন, তবে কেন, আজ, আজ—
সমুদ্রের মতো নীল আলো ঘিরে আছে তোমাদের বাড়ি ?
কেন একটি যুবককে ঘিরে অজস্র মানুষ আসে, পেছনে সানাই ?

আজ আমার মরবার দিন। শোনো—
যখনই সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে মনে হয় জ্বলছে আগুন।
বিবাহকে মেনে তুমি সহমরণের দিকে এগিয়ে আসছো।

দৃশ্য

চৈত্রর বিলের ধারে ব'সে আছে একঝাঁক বক।
ভিখারির মতো সারাদিন কাদা ও শ্যাওলার কাছে নতমুখ
জল-পারদের কাছে নতমুখ।

আমাদের বিবাহের ছ'বছর শেষ হলো।
একটি সন্তান আছে, দয়াময়। একটি সন্ততি, রেণুবালা।
তবুও বিলের দৃশ্য আমাকে ভাবায়।

জলের ভেতর থেকে ভেসে উঠে মাছ-মেয়ে জলে ডুবে যায়।

নকুল মণ্ডল

ভাটিখানা

যখন নিভে গেছে প্রতিটি বাড়ীর বাতি, যখন
বালিশ আঁকড়ে তোমরা সুগভীর ঘুমে
তখনও বাজারের কাছাকাছি পথের ধারে চাগিয়ে ওঠা বেআইনী
মদের ঠেকে হ্যাজাকের রহস্যময় আলো, হরিদার ব্যস্ত ছোটাছুটি
এবং এক দুঃখী মদ্যপ কিছুটা নেশার ঘোরে বুক উজাড় গল্প
করছে তার বউয়ের সঙ্গে এক প্রফেসরের সম্পর্ক বিষয়ে

এক পুলিশ মনযোগসহ বিশ্লেষণের চেষ্টায় অপরাধতত্ত্ব
এক লরিচালক তার সঙ্গীকে মালিকের দুর্ব্যবহার নিয়ে
এক তরুণ সদ্য দেখে আশা হিন্দি সিনেমার নায়িকার সঙ্গে
এক ছাত্রনেতা ছাত্রদের নৈতিক স্খলন প্রসঙ্গে
এবং এই শহরের বিশিষ্ট হৃদয়-কবি প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে দুঃখে
বিষের বদলে এক কোণে পান করে চলেছে প্রচুর মদ
আর তাদের দিকে তাড়াহুড়ো গেলাশ পৌঁছে দিচ্ছে যে ছেলেটি—
এক মাতাল মদ্যপান সারা হ'লে পয়সা মেটাতে গিয়ে দ্যাখে—
সেই দশম বালক, এক ফাঁকে চুমুকে নিয়েছে তুলে
গেলাশের শেষ তলানি।

অরুণ সাধুখাঁ

একজন সন্ন্যাসীর ছবি

উজ্জ্বল আলোয় ভরেছে মুখশ্রী,
দৃপ্ত চোখে বিশাল আকাশের মূর্তি,
ঢেউয়ের মতো ভেসে যাচ্ছে পা দুখানি।

বাতাসে কীর্তনের সুর,
তীব্র আসক্তি ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে নদী।

দেখি জলের ভিতরে জলের আত্মসমর্পণ,
চারদিকে নির্ভার আকাশ।

কবি

ওই তো কবি,
যিনি বাঁশের সেতুর ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছেন।
বাঁশের সেতু টলছে কবির পদভরে,
কিন্তু কবি টলছেন না,
তাঁর দুপাশে একই জলের ধারা প্রবাহিত,
কবি চলেছেন পশ্চিম থেকে পূবে,

ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সূর্য,
ফুটে উঠল নীরব চিৎকারের উৎসগুলো,
ফুলগুলি বৃন্তচ্যুত, তাই শুকোচ্ছে রোদ্দুরে,
যেন শুকনো কান্না,
কবি তাঁর চোখ থেকে ঢেলে দিচ্ছেন করুণার ধারা
কবির অন্তরে আছে অমৃতের কুম্ভ।

উমিলা চক্রবর্তী

স্বপ্নবেহুলা

অভ্যাসের ক্লান্ত পাঁক টানি,
বেকার আগুপিছু।
কঞ্জুষ হাওয়ার কাছে দিনভাতা
বাঁচার তাগিদে।
এখানে কামনা অবয়বহীন স্মৃতি
মাঝখানে,
লোহার বাসরঘরে অনেক পুরনো রাত
কালিমাখা,
ক্ষীণজীবী প্রদীপের মুখে
চুণকালি।

নাগিনীর ছিদ্রভেদী আগুন নিঃশ্বাস
শুধু স্বপ্ন ?
চম্পকনগরে ঘুম ভেঙে আমূল বিষের মতো
শেষ ফণা
আছড়িয়ে পড়ে যদি ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো
লোহার দরজা ভেঙে
নীল লাজবস্ত্রতলে
মুক্তির মঙ্গলজলে
পুষ্পগন্ধ চন্দনবাতাসে
শুভদৃষ্টি হয়,
আলোটানা কলার মান্দাসে
দূর স্বর্গে পাড়ি।

একাকী ছায়ায়

সামানাই শামুকে রেখেছি।
বাকিটুকু
টান রোদে কুমিরের পিঠ।
সন্তর্পণ হাওয়া
ট্যাকে ক'রে মেছো গন্ধ এনে দেয় চুপিচুপি,
একঠেঙে বক সসম্ভ্রমে রাস্তা দেয়।
রাজকীয় অভিযান
দিনযাপনের।

সবুজ পাতারা তবু ডাকে
নিঃসঙ্গ শামুক হাঁটে
একাকী ছায়ায়।

ডিক্টেটর

মড়ার খুলিতে মদ ভ'রে
শ্মশানে ডেকেছ উগ্রচণ্ডা।

চৌষক উল্লাস
সাঁওতাল পাড়ার নাচ রক্তে দ্রিমি দ্রিমি।

খুলির বরণমালা হাতে
রক্তের শ্যাওলা জমা
পেছল রাস্তায়
দৃপ্তভিক্ষা সুধাপাত্র।

তবু হাত কাঁপে,
মদ ছলকে পড়ে খুলি থেকে।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

ভাসান

পাথর কুড়িয়ে কোনদিন খেলা করেছি
আজ তা জমাট বেঁধে দুঃখ হয়েছে।

নদী নিয়ে কোনদিন স্বপ্ন দেখেছি
আজ তা কান্না হ'য়ে চোখে মিশেছে।

মাটি নিয়ে কোনদিন দুঃখ করেছি
আজ তা মূর্তি হয়ে জলে ভেসে গেছে।

বিকাশ সরকার

শীত ১৯৮৪

উষ্ণতাহীন, প্রায় উদোম বালক ও বালিকার মত
এই একটা শীত খুব অনায়াস কেটে গেল মদ ও মাংসগানে···
তুষারগুঁড়ো, মারাত্মক হাওয়া, ঠাণ্ডা নদীর সাথে
কেটে গেল
জলচর শামুকের শাঁস আর সস্তা কন্দমূল
আমরা পাইনে ঝুলিয়ে দিলাম বেশবাস
নগ্ন উপত্যকা, নগ্ন টিলার উপর ডেকে উঠি জোরে
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি, নগ্ন ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ···
ঝর্ণার হাসি, পাহাড়ের অভিমান আর বনের আদিম
আমাদের এই শীতে শিক্ষিত করে···
প্রাগৈতিহাসিক, রাজনীতিবর্জিত দুই বালক ও বালিকা
আমরা গান করি উষ্ণতার
আমাদের আলিঙ্গনের শব্দে ছুটে আসে পার্বত্য পায়রা
ছুটে আসে স্বপ্নকাম, লেলিহান শীত

ঘোড়া

অরণ্যের ধারে শূন্য আস্তাবল ; তুমি অনায়াস, তাতে ঢুকে, বললে
'ঘোড়া কই ঘোড়া'···
তোমার ভিতরে ফুটে উঠলো বেলাবেলি, স্তনবৃন্তে ফুটে উঠলো বাদাম চিহ্ন
পায়ের কাছে নালের ছাপ, শঙ্কর মাছের চাবুক, কাদা
তুমি বললে
'ঘোড়া খুব ছোটে ; ঘোড়ার মত দুরন্ত সন্তান চাই আমার'
ব'লে, তুমি আকাশে উড়িয়ে দিলে বেশবাস, লজ্জা ও ভয়
দু'হাত বাড়িয়ে শুয়ে পড়লে খর চাবুকের পাশে
কাদা ও জিনের উপর
ঊরুসন্ধিতে ত্রিকোণ ফুল, উত্তেজিত দু'পায়ে তুমি ঢেকে দিলে সমস্ত রোদ
দশ মাস দূর থেকে শোনা গেল হ্রেষাধ্বনি, ভয়ঙ্কর নালের আওয়াজ

কালীকৃষ্ণ গুহ

সময়

আমরা কবে আবার মিলিত হবো, এই প্রশ্ন।

কালো ফকিরের দিকে সেই যে হঠাৎ এগিয়ে যাওয়া, আলখাল্লা ছুঁয়ে-থাকা
উন্মাদ হাসির বিনিময়ে সেই আত্মপরিচয়
সেই জটা ও রুদ্রাক্ষ, শিঙ্গা—
সেই শেষ রৌদ্রে বাবলাগাছের সঙ্গে মিশে, শূন্যে, নির্মিত আকাশে মিশে
আমাদের জয়দেব যাওয়া ছিলো অবিস্মরণীয়।

গান এলো বিশ্বনাথ পবনের শরীর ছাপিয়ে, এলো রাত্রি—
শ্যামিয়ানা অতিক্রম ক'রে মাটি ও খড়ের পাশে
নেমে এলো গাথা।
এলো নেশা বিনিদ্র মেয়েকে ঘিরে, শেষে। এলো আরো গান
হালিমের—পিতার আনন্দ থেকে পরিবেশ থেকে, রাত্রি জুড়ে,
অজ্ঞানতা বেদনার মৃত্যুত্তীর্ণ গান।

এইভাবে একবার মিলিত হয়েছি।

২.
শহর-জীবন সে তো পেট্রোল-শাসিত, নগ্ন, বিচ্ছিন্ন, ভৌতিক।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠি।
'অমিয় আছেন ?'
অদ্ভুত। বিকেল। অমিয় রয়েছে, একা।
কথা হয়।
একঘেয়ে পরিচিত কথা।
সংরক্ত হবার জন্য দুজনে নির্মাণ করি কথা।
আমরা সমস্ত কিছু রেখে যাবো, তাই কিছু গ'ড়ে তুলতে চাই, তাই
শান্তিনিকেতনে একখণ্ড জমি, তাই কাব্য প্রবন্ধ-রচনা, তাই…আহ্
কথা বন্ধ হোক।

'বিটোফেন শোনান, অমিয়।'
শুনি, সপ্তম সিম্ফনি। সমাজ-বিপ্লব যেন ঘটে যায়—
বিপুল কম্পন ঘটে অবরুদ্ধ অন্তর-জীবনে।
বিহ্বলতা ঘেরে চারপাশ। অকস্মাৎ
আলো বন্ধ হয়।

এবার হাওয়ার দিকে যাওয়া।

'নিবেদিতা কোথায় থাকেন ? তার থাকা
বিশুদ্ধ, অম্লান। চলুন, অমিয়, চলুন এগিয়ে যাই, গুঁড়ি মেরে যাই
বন্ধুত্বের উদাসীন স্তরে, কিছুক্ষণের জন্য,
একবার ডাকি।'
একবার ডাকি। ডাক পাই প্রতিক্রিয়া থেকে।
টের পাই বিচ্ছিন্নতা, কুশল মিত্রের কাব্য, দোলাচল, সতর্কতা-জাত হাসাহাসি—
আরবদেশের বার্তা টের পাই, কালো স্বপ্ন-কথা।

৩.
আমরা হয়তো আর মিলিত হবো না।
আমরা মানে কারা ?
জায়মান এই প্রশ্ন নৈতিকতার এক উৎস রচনা করে।
আমরা মানে রৌদ্রময়তার দিকে যেতে গিয়ে যারা অতি দীর্ঘ
বিশ্রাম নিয়েছি, ফলে, পৌঁছতে পারি নি ?

আমরা মানে সিউড়ী-বোলপুর ঘুরে কোপাইয়ের ধারে যারা পৌঁছতে পেরেছি খুব
শীতে ?

আমরা মানে যাদের প্রতীক্ষা ভেঙ্গে দিয়ে রাত্রির শীতল নদী
পার হয়েছিল এক বুড়ি ?
আমরা মানে যারা এই জীবনের পরিচয় নিতে গিয়ে ম্লান হয়ে কালো হয়ে গেছি ?

আমরা মানে ব্যক্তি ও ধারণা—ব্যক্তির ভিন্নতা থেকে দৃশ্যের গঠন ?

৪.
এবছর আমগাছগুলি ভ'রে রাশিরাশি মুকুল এসেছে।
এতো যে মুকুল, কেউ লক্ষ করে ?
একটি সপ্তাহ কাটে এই কথা ভেবে।
ভাবি, সূর্য ক্ষয় আনে—আমের শাখায় আনে অজস্র মুকুল।

জন্মান্তর লক্ষ করি। অয়শ্চক্র। মৃত্যুর নিয়ম।

জন্মান্তর লক্ষ ক'রে নগ্ন অনুভূতিময় নারী আমাদের অদূরে দাঁড়িয়ে।

৫.
বৃন্দাবন-কে একটি চিঠি লিখি দীর্ঘ রাত্রি জেগে।
ঘুমের সীমান্ত থেকে লিখি পোস্টকার্ড। লিখি
'বৃন্দাবন, কবিতা-লেখার অভিশাপ এখনো বহন ক'রে চলেছি জীবনে—
এই সত্য, বিমূর্ততা, লণ্ঠন-বিন্যাস, একা একা বজবজ ফেরার পথে মেনে নিও।
চারপাশে দেখেছি পাপীর স্পর্ধা, বৃন্দাবন, সতর্ক নিথর চোখ
দেখি চেয়ে আছে।
দেখি মূর্খ সম্পাদক মূর্খতর সম্পাদকের গলায় পরিয়ে দেয় মালা
আর দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে হাসে।'

মনে হয়, বৃন্দাবন নির্জনতা থেকে বুঝে নিতে পারবে কিছুটা সত্য, কিছু অস্পষ্টতা।

৬.
তাহলে বস্তুর দিকে যেতে হবে, বস্তুপৃথিবীর দিকে, বস্তুর বলয়ে

যেখানে চেয়ার পাতা থাকে এক শূন্যতার পাশে

যেখানে টেবিল থাকে অনিঃশেষ, ফাঁকা
যেখানে মানুষ একা লক্ষ করে সবকিছু ক্লান্তিহীন মৌল অবসাদে
যেখানে কলম চশমা বই নক্ষত্রের আলো অতি স্থির দৃশ্য রচনা করে
যেখানে ঘুমের প্রান্তে জেগে থাকে মাথা
যেখানে গীর্জার ধ্বনি নিরন্তর অন্ধকারে মেশে
যেখানে পাগল যায় পশুপাখিদের দিকে দৌড়ে, সংজ্ঞাহীন
যেখানে নারীরা ভাবে মুখোশের দেশে উড়ে যাবে
যেখানে সন্ধ্যার কাক অর্থহীন ডাকে বারংবার

সেইখানে বস্তুর স্তব্ধতা।

আমরা যারা অন্ধ হয়ে যাবো এই শতাব্দীর শেষে, অথবা বধির, মৃত
জেনেছি কিছুটা এইসব।

৭.

ভাবো, এখনো অনেক লেখা বাকি আছে।
ভাবো, লেখা অসমাপ্তভাবে আজ শেষ হয়ে এলো।

সাক্ষী ওই বাড়ন্ত উদ্ভিদ, সাক্ষী ছেলে।

ভাবো, বেশি সত্য ব্যাঙ্কের মিটিং আর সেমিনার হল আর মঞ্চ, ছদ্মবেশ।

চন্দন দত্ত

টুকরো ছবি : ১

হলুদ জ্যোৎস্নায় কারা ঐ ধূ-ধূ প্রান্তরে
হেঁটে যায় নিমগন্ধে আবিষ্ট-তন্ময়
ওরা পরপুরুষের আদিম পার্ষদ ?
না কি নাদ অন্ধকারে শব্দের সন্ন্যাসী
ছুঁড়ে দ্যায় ভস্মরাশি প্রাকৃত অম্বরে।

অজ্ঞাতবাস

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ভোরে ছিঁড়ে ফেলি সংবাদপত্রের ঘোর ছায়া

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের মধ্যেও শারীরিক ও বিভিন্ন দূরত্ব বাড়তে থাকছে। আমরা সবাই কিছু কিছু লিখি বা না লিখি, লেখার কথা ভেবে যাই। গোড়ার দিকে আমাদের ধারনা ছিল আমরা সকলেই যথেষ্ট প্রতিভাবান। কিন্তু এখন বুঝতে পারি আমাদের সেই ধারনা সত্যি ছিল। এই যে সৃষ্ট দূরত্ব তা অনেকের কাছে মনে হয় স্বাভাবিক, অনেকের কাছে মনে হয় স্বাভাবিক নয়, যাদের কাছে দ্বিতীয়টি মনে হয় তাদের সপক্ষেও যুক্তি কিছু কম নেই কারণ এই বিচ্ছিন্নতা সবটাই কিছু সাহিত্যাদর্শগত নয়, রাজনৈতিকও নয়।

প্রত্যেক লেখকই একেকটি সার্বভৌম গ্রহ নক্ষত্র অর্থাৎ লেখকপিছু একেকটি কাগজ, এতটা উগ্রপন্থায় আমি এখনও বিশ্বাস করি না। "বয়েস অনেক হলো, ডেডিকেশানও অনেক, কিন্তু খ্যাতি তো কই পেলাম না" এই সংক্ষিপ্ত, গভীর মর্মবেদনা, যা ইতস্তত শোনা যায় তার পার্থক্যই আমাদের দূরত্বের নিবিড় কারণ এটা যারা মনে করে তারা ভুল করে না। বলতে আজ আর দ্বিধা থাকার কথা নয় যে খ্যাতিকে আমার অনেক বন্ধুই 'একমাত্র আনন্দবাজারের কামান থেকেই ছুড়ে দেওয়া যায় গোলা' হিসেবে ভেবেছিলেন, যার বিপরীতে শীত, অখ্যাতি, ফাঁকা অন্ধকার। আমি কোনো অখ্যাত আভিজাত্যের রুগী নই। অন্ধকার কুয়োর ভেতরেই শুধু পড়ে থাকে বৈদুর্যমনিটি—এই রোমান্টিকতাতেও আমি নেই। সমরেশ মজুমদার অকাদেমী পাচ্ছে।* যে কোনো সাধারণ হৃদয়বান পাঠকের মত আমার পক্ষেও তা সহ্য করা কঠিন। সাহিত্য খুব-স্বাভাবিকভাবে ছাপা হোক, পড়া হোক, অনেকে পড়ুক, প্রবল তর্ক হোক, কথা হোক, জীবনযাপনের মধ্যে সাহিত্য ফুটবল অভ্যাসের মতো থেকে যাক এই রকম চেয়েছিলাম। আমার বক্তব্য অনেকের কাছে, আমি জানি, দুভাবে ধর্মদ্রোহী বলে মনে হচ্ছে এবং এই কারণে যারা আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদের ফন্দি আঁটছেন তাদের আমার তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, যদিও তরফ বলতে আমার কি আছে আমি জানি না।

অবশ্য তাতে কিছু হেরফের হয় না। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের আচরণ প্রধানত ক্যালাসনেসের পর্য্যায়ে পড়েছে। অবশ্য প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার যে পঞ্চাশে গল্প আমরা আমাদের সাহিত্যিক ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি তার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়াও যে আমাদের এই এতটা ক্যালাসনেসের কারণ—এই যুক্তিকেও মান্য করা উচিত। কিন্তু আমাদের আরও দায়িত্ব সচেতন হয়ে কাজ করার কথা ছিল। আমরা কিছুই করি নি। কারণ আমরা কখনও চালু কয়েকটা ভুল ধারণার খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানকৃত অন্যায়ের স্বরূপ নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমরা

* লেখাটি সুনীল গাঙ্গুলী আকাদেমী পাওয়ার আগে লেখা।

তেইশ

বিভিন্ন আড্ডায় আমাদের ভাবভাবনা টুকটাক প্রকাশ করেছি মাত্র, যার তো কোনো মাইনিউটসও নেই। আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকার বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করার বা সুযোগ পেলে তাতে ঢুকে পড়ার ব্যক্তিগত বাসনা সোচ্চারে অথবা নীরবে একে অপরকে বুঝিয়েছি মাত্র। কিন্তু এই 'লাভ-হেট রিলেশনশিপ'-এর কাদা, এই প্রতিষ্ঠানকমপ্লেক্সজনিত পাঁক ঠেলে সরিয়ে কোনোদিন একটা চাপ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি নি, যা দিয়ে সামগ্রিক আবহাওয়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন করা যায় এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশকে কিঞ্চিৎ বেশী বাসযোগ্য করে তোল যায়। এমনকি সব মিলিয়ে তোমার ও পথ পানে চাহি যে শুধু আমাদের পাখী গান গাহে না এটাও প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এখন, এমন নয় যে আমাদের ভিত্তিতা, ভুল বোঝাবুঝিতে নিদেনপক্ষে সৃষ্ট দূরত্বে উপরোক্ত ব্যর্থতার কোনো অবদান নেই। প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এইভাবেই সফল হচ্ছে, তবু এটা তার একটা প্রায় অনুল্লেখ্য উদাহরণ মাত্র।

আমাদের ভাষায় লেখালিখি বিশেষত উপন্যাস ও প্রবন্ধকে দেশানন্দবাজার প্রধানত শেষ করে দিয়েছে ও দিয়ে চলেছে। এই বাক্যটি এর চেয়ে আর সামান্যতম অস্পষ্ট করে বলার সুযোগও আর নেই, বরং উল্টোটা করার জন্য আমি আজ যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজী আছি কারণ সামগ্রিক ভাবভাবনায় সাহিত্যেরই চারপাশে নিরন্তর ঘোরা এক সামান্য বাঙালী হিসেবেও মর্মে মর্মে আজ আমি টের পাই এমনকি ব্যক্তিগত এক ভয়াবহ বিপন্নতা। এই নয় যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উক্ত সিদ্ধান্তটি আজ মধ্যরাত্রে আমিই প্রথম বোধ করলাম, কিন্তু যা আমি একটু আগেও বলার চেষ্টা করেছি, আবার জানিয়ে রাখছি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আমাদের যে অলিখন তা উদাসীনতা, না সুযোগসন্ধান এ বুঝতে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান তো সব দেশেই আছে যেহেতু সাহিত্য সৃষ্টি হয় ছাপার জন্য এবং ছাপতে পয়সা লাগে। এর পেছনে টাকা লগ্নী করতে গাঁটের জোর লাগে। ফলে টাকা যে লগ্নী করে মুনাফাই তার মূল লক্ষ্য। সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যবাণিজ্য যে আলাদা অথচ পরস্পর নির্ভরশীল দুটো ডিপার্টমেন্ট, এই সত্যে কোনো শুদ্ধতাম্যানিয়াকেরও আজ আর কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক, পরিণত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে নিতান্ত সামন্ততান্ত্রিক অতিলোভ দিয়ে চালিয়ে গেলে উৎপাদনের মাল যতটা নিকৃষ্ট হতে পারে আমাদের ভাষায় ঠিক ততটাই হয়েছে। যে টাকা লগ্নী করে মুনাফাই তার মূল লক্ষ্য কিন্তু একমাত্র কাম্য নয়। একজন ধনতান্ত্রিক মালিককে একজন সামন্তপ্রভুর চেয়ে বেশী কিছু মেনে নিতেই হয়, নইলে উৎপাদিত বস্তু কোনো প্রতিযোগিতামূলক মানে পৌঁছয় না।

ফলে পৃথিবীতে সাহিত্য প্রতিষ্ঠান অথবা সাহিত্য ছাপানোর বড় বড় বাণিজ্যিক বাড়ি সর্বত্রই আছে। কিন্তু একটা খবরের কাগজ একটা সাময়িক কাগজ কোথাও সাহিত্য ছাপানোর প্রতিষ্ঠান নয় যেখানে একটি ভাষার দাবীকৃত শ্রেষ্ঠ অথবা সর্বাধিক বিক্রীত লেখকরা চাকরগিরি করেন অথবা এই মর্মে মুচলেকা দেন 'এবার অন্য কোথাও উপন্যাস লিখছেন না'। এবং এই সম্পূর্ণ হত্যাকাণ্ডটি থাকে এমনই

এক গ্ল্যামারের মোড়কে যাতে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকা অধিকাংশ অগুন্তি লেখক, লেখক হওনেচ্ছু জনতার একমাত্র অবসেশনই হয়ে দাঁড়ায়, কিভাবে ঐ ধ্বংসপ্রকল্পে সামিল হওয়া যায়। কিভাবে সেঁধোনো যায় ঐ কল্পতরু বাড়িটির গহ্বরে, যা একাধারে চাকরী, স্পেস নিশ্চিন্তা, গ্যারান্টেড যশ ও তৎপ্রতিফলিত অর্থের বিস্ময়কর প্রতীক। আত্মাস্থা ও আত্মসম্মানের ঊর্দ্ধে উঠতে পারা মনুষ্যগণ এ বাবদ অচিরেই দৌড়ঝাঁপ, লেখা তৈরী ও নানা প্রকার যোগাযোগ করতে শুরু করে দেন। কিন্তু নিজের ও নিজের লেখার প্রতি সম্মানশীল অনেক লেখকদেরও এমন কি দেখেছি ঐসব কিছু না করে শুধু এটা ভেবেই এলিয়ে থাকতে যে 'একদিন শুদ্ধপ্রভাতে নির্ঘাৎ সাগরময় ঘোষ প্রেরিত আলোকরথ এসে থামবে দুয়ারে এবং উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি সমেত আমি তাতে আরোহণ করব প্রাসাদের উদ্দেশে'। কিন্তু তা হওয়ার নয়, প্রতিষ্ঠানের ডাকের পদ্ধতি বড় বিচিত্র, শুধু নিওন সাইন, বড় প্রচ্ছন্ন ইশারা যার প্রতি লেখকদেরও ততোধিক প্রচ্ছন্ন উত্তরপ্ল্যাকার্ডটি ঝোলানোই আছে 'উঁহু ওভাবে হচ্ছে না, আরও বড় করে ডাকো, অন্তত একবার'। এই খেলা সমানেই চলেছে। অবশ্য এসব আমার বলার ছিল এই লেখাটির আরও গভীরে গিয়ে, যা আমি যথাস্থানান্তরে নিশ্চয় আবার পরিষ্কার করে বলব, কারণ আমার কথার মধ্যে সামান্য কিছু ফাঁক হয়তো থেকে যাচ্ছে যা বোজানোর আগে আরও অনেক অন্য কথার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক বিক্রিত লেখকেরা এমন কোনো আত্মসম্মানবোধের ধার ধারে না যার দিকে তাকিয়ে অন্য অরেকজন লেখক আত্মসম্মানী হতে পারেন। এটা কোনো প্রফেশনালিজম নয়, অন্য কিছু কি না আমি জানি না। এদের দেখে আমার এক হ্যাণ্ডটুমাউথ বয়োজেষ্ঠের কথা মনে পড়ে যায়। নিজের ঘুষ খাওয়া সম্পর্কে যার বক্তব্য ছিল—জন্মেছি কেরানি হয়ে তায় আবার আত্মসম্মানবোধ।

আমাদের ভাষার সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, কোনো প্রকাশনা সংস্থা সাহিত্য ছাপার নেতৃত্বে নেই, আছে খবরের কাগজ। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সাহিত্য সংবাদের মতোই সাময়িক ও ফীচারের মতোই ফিচেল হয়ে উঠতে ক্রমাগত প্রশ্রয় ও পুষ্টি পেয়ে চলেছে। এখানে উপন্যাস লেখা হয় পুজো, দোল, পয়লা বৈশাখে। পৃথিবীতে অন্য কোথাও ক্রীসমাস, ইস্টার, গুড্‌ফ্রাইডে-তে একজন লেখক উপন্যাস লেখার প্রেরণা পায় বলে আমার জানা নেই। এখানে প্রথমেই বাণিজ্যিক বাড়িগুলি একজন লেখকের লেখার তাগিদের যে নিজস্ব কাঠামো সেটা ভেঙে দিয়েছে, গুলিয়ে দিয়েছে, এবং লেখকের মাথা থেকে এ বিষয়ে সংকর্তার যে ঘিলুটা সেটা টেনে বার করে এনেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস লিখতে শুরু করার ইতিহাস, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার কথোপোকথন আমরা সবাই জানি। উপন্যাস লেখা ব্যাপারটা সুনীলের কাছে যেমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়, ঠিক আছে এবং তিনি কোনো বড় লেখক নন—ফলে এই হাল্কা ন্যাকামি তার কোনো ক্ষতি করে নি কারণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারার যোগ্যতাটুকুও তিনি হারিয়ে বসেছেন। কিন্তু একটা ভাষার কতবড় হতকপাল যে এই লজ্জা-

কর ইতিহাস প্রচার পেয়েছে যে কোনো বড় সাহিত্য ভাবনার মতো করে, সাহিত্য আলোড়নের মত করে। এইভাবে আমাদের ভাষায় সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র নিজেদের নাক কেটেই নিরস্ত হচ্ছে না, বিভিন্ন কায়দায় সাহিত্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাবভাবনার কোমর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টাও নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কি সফল হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর হবে অংশত 'না', কিন্তু অধিকাংশত 'হ্যাঁ'। এবং তার মূল কারণ আমরাই—আমরা অজস্র অখ্যাত, অপ্রখ্যাত সাহিত্যেচ্ছু তরুণ, আধাতরুণ, অতরুণ বাঙালীজনতা, যাদের মধ্যে উচ্চকোটীর অর্দ্ধোন্মাদ ভাবুক থেকে শুরু করে বড় কাগজে নাম ছাপিয়ে রীতাশীলামালবিকাকে ইমপ্রেস করতে চাওয়া যুবক পর্যন্ত সবাই রয়েছে। এ এক বড় অজব আজ কা দৌড়—এই শারদীয় দৌড়, যে দৌড়ে নেমে পড়তে পারাই আমাদের প্রদেশে সাহিত্যিক হিসেবে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিভাত। এমনকি আমার বন্ধুরা, সমবয়সীরাও এর চেয়ে অন্যকিছু ভেবেছেন কি? ভাবলেও তার কোনো খোঁজ লিপিআকারে পাওয়া যায় না। এইভাবে আমারাও যে একটা প্রতিষ্ঠানরুত জাতীয় দুর্ভাগ্যের সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বেড়ে উঠছি এটাও ওই কাগজওয়ালারা চায়।

পুজোয় আমাদের দেশে চতুর্দিকে সাজসাজ রব পড়ে যায়—ধরা যাক এটা একটা স্কুলরচনা যার প্রথম লাইনটা ঐরকম, যারপরে লেখা হবে 'দর্জি জামা-কাপড়ের ডিজাইন নিয়ে ভাবতে বসে, মুচি বসে জুতো নিয়ে, কুমোর বসে প্রতিমা নিয়ে ইত্যাদি'। কিন্তু হে একজামিনার, কোনো মেধাবী ছাত্র যদি লিখে ফ্যালে যে লেখক বসে উপন্যাস নিয়ে তাহলে কি তার দেখার ক্ষমতার জন্যে আপনি তাকে বেশী নম্বর দেবেন নাকি আপনার ভাষার প্রিয় সাহিত্যকে এতদ্বারা অবমাননা করা হল বলে কম নম্বর দেবেন সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সাহিত্যকে ক্রমাগত গুরুত্বহীন, ভাবনাহীন, পার্থক্যহীন করে তোলা হচ্ছে। এবং যতই সে ওইরকম হয়ে উঠবে তত লাভ, ততই দায়হীনতা, স্বস্তি। একটা ভাল লেখা থেকে একটা খারাপ লেখাকে আলাদা করে কে—সমালোচনা, সমালোচক। পৃথিবীর সর্বত্রই সমালোচকরা আছেন বলেই ভাল লেখা খারাপ লেখার ভিড়ে হারিয়ে যায় না। এমনকি সমালোচকেরা লেখকদের চেয়ে খুব প্রতিভাবান হলে সেক্সপীয়ারকেও পশ্চারিটি নিয়ে ভাবতে হত। কিন্তু আমাদের ভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য অত্যন্ত systemetically গড়ে উঠতে দেওয়া হয় নি। উঠলেই তো সমস্যা। মুড়ি ও মিছরীর দর এক কেন এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হবে। তাহলেই সমস্যা। পাঠকের রুচি গড়ে উঠবে। সে এটা নয় ওটা, এটাকে নিয়ে সেটাকে বাদ দাও বায়না ধরবে। সমালোচনা যে পাঠকের হাতিয়ার, আর সমালোচক পাঠকবর্গের নেতৃত্ব দেন। প্রতিষ্ঠান চায় ভেদবুদ্ধিহীন, মুগ্ধ ক্রেতা—পাঠক চায় না। তাই আমাদের ভাষায় সমালোচনার ধারা systemetically গড়ে উঠতে দেওয়া হয় নি। অবশ্য ওরা যেসব মাল নিয়ে ব্যাবসা করে তাতে সমালোচনা-বিতর্কের রিস্কও নেওয়া যায় না। ফলে এখানে যে ধারাটিকে সযত্নে লালন করা হয়েছে ও হচ্ছে তা হল লেখাকে ভুলিয়ে দেওয়ার ধারা। গত দশ-বারো বছরে কি নতুন লেখা উপন্যাস পড়েছি

মনে পড়ে না—মনেই পড়ে না তো উল্লেখ্য কিনা সে ভাবনায় জড়িয়ে পড়া তো দূরের কথা। এরমধ্যে একটাও ভাল লেখা ছিল না? আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। সেইমতই চাওয়া হয়, সেই চর্চ্চাই এখানে অতিযত্নের সঙ্গে করা হয় কারণ এদেশে কোনো সমালোচনা নেই।

সমালোচনা কি করে? সমালোচনা বড় লেখাকে বাজে লেখার থেকে আলাদা করে। একটি লেখাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তার বিভিন্ন ডায়মেনশন-গুলিকে যথাসম্ভব রেখাবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। একজন লেখকের ভাবভাবনার জটিল ভূগোলকে মানচিত্রায়িত করার চেষ্টা করে, যদিও লেখক নামক স্থায়ী ক্ষয়কারী স্রোত বা ভূকম্পনপ্রতিভা সেই মানচিত্রকে অনবরত পাল্টে দেওয়ার হুমকি সমালোচকের নাকের ওপরে বসেই দিয়ে যায়, কিন্তু সমালোচকও কম নাছোড় প্রার্থী নন। The critic, like the joiner, the plumber, and the doctor, is a person who goes about the world with a bag of tools. If you wish to size up a painter, a poet, a writer, a composer or any other artist and are unable to do so your-self, you call in the critic He arrives with his bag, unpacks his set of standards, applies them more or less skillfully and gives you his diagnosis. If his standards are not your standard he has told you nothing you want to know about the artist, though incidentally he will have told you much about himself. He is a very limited creature : he can use only his own tools which are the product of his age and experience. এবং এই অংশটা যে আমি উদ্ধৃত করলাম তা শুধু আয়ো ইংলিশ কোটেশান দিতে পারি সেটা দেখানোর জন্য নয়। আমার বক্তব্য হল ওই লিমিটেড ক্রীচারের প্রয়োজন আমাদের অসীম, নাহলে সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সমালোচনা ভাল লেখাগুলোকে নিয়ে ক্রমাগত তর্ক ক'রে বিতর্ক ক'রে একটা দুর্ভেদ্য রুচিপর্দা তৈরী করে যার মধ্যে দিয়ে বটতলার গলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। হ্যারল্ড রবিন্স ও নিদেন জন আপডাইকও যে আলাদা জাতের লেখক এটা মনে রাখানোই সমালোচনার আদত কাজ। আমাদের দেশে লেখা ও লেখককে বিস্মৃত ক'রে দেওয়ার বিস্তৃত চর্চ্চা আজ এতদূর পৌঁছেছে যে আমার তো মনেই পড়ে না গত বহু বছরের মধ্যে কোনো লেখাকে নিয়ে কোনো মনে রাখার মতো লিখিত বিতর্ক হয়েছে। অথচ এই বছর-গুলিতে অনেক নতুন লেখকও দেশানন্দবাজারে লেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের একটা লেখাও কি ভাল ছিল না? বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁদের অনেকেই হয়তো প্রাণপনে তাঁদের শ্রেষ্ঠ লেখাটিই লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুই লাভ হয় নি। শারদীয়ায় রমানাথ রায়ও উপন্যাস লিখেছেন, কঙ্কাবতী দত্তও উপন্যাস লিখেছেন। এর বেশী কিছু নয়, Nothing stands out. কারণ আমাদের সমালোচনাহীনতার পুরুষ্ট ধারা কোনো outstanding হওয়ার ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দেয় না।

কঙ্কাবতী প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল এই মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য পড়তে গিয়ে অর্থাৎ আশি একাশি হবে। আমি তাকে খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করতাম তা শুধু সে সুন্দরী ছিল বলেই নয়, সে ছিল লেখিকা এবং প্রায় আমারই বয়সী। আমি বিস্ময়ের শিখরে গালে হাত দিয়ে বসে দেখতাম ভাষা ব্যবহার, লেখালেখি ইত্যাদি বিষয়ে তার ধারণা কত স্বচ্ছ। আমি বিশ্বাস করি, একজন যখন লিখতে শুরু করে তখন প্রচলিত ভাষাভঙ্গির প্রতি ক্রোধই ফর্মের দিক থেকে তার প্রধান সম্বল হয়। 'দেশে' লেখবার মতো ভাষাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে কেউ লেখা শুরু করে ব'লে আমার জানা ছিল না। একজন লেখক শুরুতে প্রচলিতের প্রতি ক্রোধবশত ভাষাকে ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে ভাষার ভেতরের যে নির্য্যাস সে পেতে চাইছে অথচ পাচ্ছেনা, তাই প্রাথমিকভাবে নিজের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয় এবং আবার চেষ্টা করে। এর ফলে প্রচুর অসংযম, গিমিক, নাটকীয়তা, প্রায় অর্থহীনতা, অতি-আবেগ তার পাকাচুল-বয়েসের হাসির খোরাক হিসেবে জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু এই ছেলেমানুষীর প্রভা দিয়েই আবিষ্কৃত হয় ভাষার অন্ধকার নতুন মহাদেশ, বিষয়কে ছুঁতে পারার নতুন আলোকপথ। এই সাহিত্যের ইতিহাস। এই ভাষার ভেতরের ভাষাকে ছোঁবার ক্রমাগত ও যন্ত্রণাকর চেষ্টার ভেতর দিয়েই একজন লেখক দেখতে পায় বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জের পরবর্তী উর্দ্ধস্তরে ওঠার লুকানো থমথমে সিঁড়ি, হাতে পায় পরিণতমনস্কতার ঘরগুলো খোলার ব্যক্তিগত চাবিগুচ্ছ। আমি কঙ্কাবতীকে দেখেছিলাম সরাসরি প্রচলিত ভাষায়, যা আস্তে আস্তে ভাষাহীনতায় লীন হয়ে যায়, সেই ভাষায় লিখতে যখন তার বয়েস মাত্র কুড়ির আশপাশ। ঐ বয়েসেই দেখেছি লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রতি তার উদাসীনতা, করুণা ও প্রায় স্নেহ। সেই বয়েসেই শুনেছি লেখালেখি, বাণিজ্যিকতা ও টাকাপয়সার সম্পর্কের অপরিহার্য্যতা নিয়ে তাকে ইতিবাচক কোণ থেকে কথা বলতে। তখনই সন্দেহ হয়েছিলো এ আনন্দবাজারের বড় লেখিকা হবে। তার কিছুদিন পরেই দেখলাম কঙ্কাবতী দত্ত শারদীয়ায় উপন্যাস লিখলেন, ভাষাকে সচেতনভাবে হত্যা করার যে ভাষা তা আরও ভাল করে তার আয়ত্তে এসেছে এইমাত্র। আর বিষয় নিয়ে কথা তুলছিই না—রুচিতে বাধছে।

অন্যদিকে শারদীয়ায় উপন্যাস লিখেছেন রমানাথ রায়ও। রমানাথ কত বড় লেখক এ প্রশ্নই নয়। এমনকি রমানাথ এ সময়ের সবচেয়ে অন্যরকম লেখক, তাও নয়। কিন্তু কারুর ভাল লাগুক আর খারাপ লাগুক রমানাথ যে নিজের গল্পের ভাষা নিজেই তৈরী করেছেন এটা স্বীকার করতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। দেশানন্দবাজার তাদের যে মেইনস্ট্রীম-ল্যাঙ্গোয়েজ তার বাইরেও দুচারজনকে জায়গা দিয়ে থাকেন, যেমন রমানাথ রায়, এমনকি ভাবা যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত। কিন্তু এই সবই তাদের কোয়ালিটি কিলিং প্রোগ্রামের একেকটি ধাপ।

অবশ্য এর পরেও অনেকেই বলে বসতে পারেন—তা সত্ত্বেও রমানাথ রায় ও

কঙ্কাবতী দত্ত যে আলাদা এটাতো বোঝাই যায়। হ্যাঁ যায়। কিন্তু এ প্রশ্নও তো আমি করবোই যে কে তা বোঝে। লেখালেখিকে যদি নিউক্লিয়াস ধরি তবে প্রথম কক্ষপথের ইলেকট্রন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, কিন্তু, এমনকি দ্বিতীয় কক্ষপথের পাঠক-ইলেকট্রনরা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণাহীন। আর দেখাই যাচ্ছে কবিতার মতো নয়, পনেরো-বিশ ফর্মার কাজকর্মের জন্য বহুলোককে লাগে।

তবে কোয়ালিটি কিলিং-এর ব্যাপারটা কবিতার ক্ষেত্রেও চালু রাখার চেষ্টা করেই যায় প্রতিষ্ঠান। যেমন, সাপ্তাহিক দেশে খুব উদারভাবে কবিতা ছাপা হয়। এত উদারভাবে ছাপা হয় যে লোকে আজ মুগ্ধ। আমার অনেক বন্ধুই অনেক কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তারা সম্ভবতঃ কখনও ভেবে দেখেন নি যে কেন লিখছেন এবং কেনই বা আনন্দবাজার তা ছাপছে। টাকার জন্য নিশ্চয় নয়, কারণ সমবছরে দুটি বা তিনটি কবিতা বাবদ দেড় বা দুশো—আমি ঠিক জানিনা কত—টাকা ছাড়া তাদের অতলান্ত দারিদ্র্য আরও গভীর হতে এই যাদের বক্তব্য তারা একধরনের যুক্তির ঠাট্টা করছেন। আর দেশে লিখে বেশী সংখ্যক কাব্যপাঠকের হাতে পৌঁছোন যায় বলে আমি বিশ্বাস করিনা, যারা লিখছেন তাঁরাও করেন না, কারণ দেশ এমন একজনও বেশী কাব্যপাঠকের হাতে পৌঁছয় না, যার কাছ থেকে খুব দূরে আছে লিটল ম্যাগাজিন। তাঁরা লিখেছেন, কেননা তাঁরা কিছু ভাবেননি। আর এইরকমই তো রীতি—লিটল ম্যাগ্‌সের পেছন মাঠগুলোতে খেলতে খেলতে সড়গড় হয়ে, বড় হয়ে, আনন্দবাজার স্টেডিয়ামে বছরে দুবার দৌড়ে আসা। আর আরও বড় হলে বাড়ীতে চিঠি আসে পুজোর আগে। কবিরা দেশে কবিতা লিখেছেন তা খুব বেশী আগুপিছু না ভেবেই আর আনন্দবাজার এসব ছেপেছে তা কবিদের প্রতি কোনো স্বীকৃতি হিসেবে নয়, কোনো উদারতা থেকেও নয়, ছেপেছে সেই কোয়ালিটি কিলিং-এর মনোবৃত্তি থেকেই। না'হলে অনির্বাণ লাহিড়ীর লেখাও ছাপা হচ্ছে হরিদাস পালের লেখাও ছাপা হচ্ছে একইসঙ্গে। কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে? তাহলে অস্বীকৃতি কাকে বলে? এটা কোয়ালিটি কিলিং ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? সাগরময়বাবু বলুন, হরিদাস পালেদের লেখা যে ক্রমাগত ছাপা হয়ে চলেছে তাকি ভাল লেখা বলে? তা কি দেশের বিক্রী আধপয়সাও বাড়াবে বলে, নাকি অনির্বাণ লাহিড়ীদের অপমান করা যাবে বলে, নিজের ওপর আস্থা রেখে সত্যি বলুন।

কিন্তু কবিদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে এই সামান্য অপমানটুকু করা ছাড়া আনন্দবাজার কোনোভাবে বাংলা কবিতার কেশস্পর্শ করতে পারে না। কারণ তারা জানে যে কবিতার শাসনভার তাদের হাতে নেই। আছে অসংখ্য খ্যাত অখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনের হাতে। বাংলা কবিতার যেটুকু যাকিছু হয়েছে তা এইজন্যই। যেমন গদ্যের, যেটুকু যা কিছু হয়নি তার কারণও প্রায় একই—গদ্যের শাসনভার প্রধানত রয়েছে খবরের কাগজের হাতে, এমনকি কবিতার ক্ষেত্রে আনন্দবাজারও যে পোষা কবি রাখতে গিয়ে শক্তি চ্যাটুর্জ্জের নীচে নামতে পারেনি তার কারণও

লিট্‌ল ম্যাগাজিন। কারণ দীর্ঘদিন ধরে তারা ভাল লেখা ছেপেছেপে, ভাল লেখাগুলোকে নিয়ে, বইগুলোকে নিয়ে ক্রমাগত তর্ক ঝগড়া ক'রে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্রোতউল্টোস্রোত নিয়ে বাক্‌-বিতণ্ডা বাঁধিয়ে এমন একটা দুর্ভেদ্য রুচিপর্দা সৃষ্টি করেছে যার ভেতর দিয়ে মাল জিনিষ গলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। শক্তি-সুনীলের গ্ল্যামার শো-এ যে টিকিট কেটে লোক আসে তার কারণ যারা ঐ গ্ল্যামার শো-এ যায় না তাদের কাছেও ওরা নির্ঘাৎ একজন কবি। নাহলে, কই, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে তো আনন্দবাজার কবি করতে পারল না।

বাংলা কবিতায় সদাসর্বদা যে অত্যন্ত উঁচু তারে বাঁধা কাব্য আলোচনা হয়েছে তা নয়, কিন্তু অনেকটাই কিছু হয়েছে। গদ্যের ক্ষেত্রে সেটুকুও হয়নি। আবার প্রশ্ন করি, সমালোচনা কি করে? সমালোচনা একজন অখ্যাত প্রতিভাবান তরুণকে হঠাৎ আবিষ্কার করে। সমালোচনা একজন লেখক কে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে। কে মানে আইডেন্‌টিটি। যেমন আমরা জানিনা ঔপন্যাসিক সুনীল গাঙ্গুলি কে, অর্থাৎ কি তার লেখ্য, কেনই বা সে তা অকারণ লিখতে চাইছে। যেমন আমি জানি কে কবি সুনীল গাঙ্গুলি। আমি কি সুনীলের কবিতা সুনীলের উপন্যাসের চেয়ে বেশি পড়েছি? না। যেমন আমি জানি কার্পেন্তিরের, মার্কেজ এরা কারা। এদের সাহিত্য আমার চেয়ে হাজার হাজার মাইল দূর ভৌগোলিক-ভাবে। এবং হয়তো পড়েছি কুল্যে এদের সাড়ে তিনখানি রচনা। অন্যদিকে সুনীল গাঙ্গুলির ৮ ডিমাই সাইজের ছ' হাজার পাতা ছোটবেলায় পড়িনি কি? অথচ আমি জানিনা আমার ভাষার অধিকছাপিত, অধিকবিক্রীত উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গো কে। আমি কেন, কেউই জানেনা। সুনীল নিজেও কি জানে, আমি সিওর নই। তারপরে ভাবুন সমরেশ মজুমদার—অকাদেমী পেলেন, কেন পেলেন কেউ জানেনা। দুলেন্দ্র ভৌমিকও পেতে পারতেন। কারুরই কিছু যেত আসত না। বুদ্ধদেব গুহও পেতে পারতেন, যাতে বাংলাসাহিত্য ছাড়া আর কারোরই কিছু ক্ষতি হতো না, আসলে একজন একটা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্য পুরস্কার পায় অথচ সাহিত্যিক হিসেবে সে কে, সে কী লেখে, কেউ জানে না। কারণ তার সম্পর্কে কোন লেখালেখি নেই, তার সাহিত্যের কোনো চলতি মূল্যায়ণ নেই। মূল্যায়ণ ব্যাপারটা লেখক মরে যাওয়ার পর অবিচুয়ারীর দু' প্যারাগ্রাফের মধ্যে সেরে দিতে হয়—সাহিত্যসমালোচনার প্রতি এই আমাদের গড়পড়্‌তা দৃষ্টিভঙ্গি—যে আনন্দে আমাদের অধিকবিক্রীত লেখকেরা পরমানন্দে লিখে চলেছেন।

একবার আমার গদ্যলেখক বন্ধুদের মধ্যে, এই বছরখানেক আগেকার কথা বলছি, দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হল। ক্ষোভের বিষয়বস্তু অনেকটা এইরকম, আমি বিদ্রুপ করতে চাইছিনা, তাদের ক্ষোভের প্রতি সম্মান দিয়েই আলোচনা করছি—আমরা কবিদের জগতে বাস করছি। এখানে একজন গদ্যকারের সেন্টিমেন্টকে গুরুত্ব দেওয়া হয়না। একজন গদ্যকারকে বুঝতে চাওয়া হয়না। আমাদের এর থেকে ভেঙে বেরোতে হবে। অর্থাৎ তারা অনেকটা সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন্স কমিউনিটির মর্মবেদনা অনুভব করেছেন। অথচ আপাতভাবে এই ক্ষোভ বিস্ময়-

কর, কারণ আমরা সবাই জানি যে আমরা কবিরা মূলত গদ্যকার শাসিত দুনিয়াতেই বসবাস করছি। কিন্তু আমার বন্ধুদের এই যে ক্ষোভ, তার মধ্যে সত্যতা তো আছেই এবং একটা উল্লেখযোগ্য দিকও আছে তা হল কবিদের পক্ষে সাধারণভাবে প্রতিকূল যে আধুনিকসমাজগতি তার মধ্যেও লিটল্‌ ম্যাগাজিন আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালী কবিরা এমন একটা পরিবেশ বা প্রতিবেশ তৈরী করে নিতে পেরেছেন, যাকে তাঁরাই শাসন করেন। ঈর্ষণীয়ভাবে, একজন বাঙালী কবিকে তাঁবেদারী না করলেও চলে। সে একজন স্বেচ্ছাচারীর মতো প্রবলভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে, যার অহঙ্কার 'কোয়ালিটি কিলার্স'দেরও ভয়ের কারণ। গত এক বছরের মধ্যে স্টুডেন্টস্‌ হলে আয়োজিত মাত্র কয়েকটি কবিসভার মধ্যে দিয়ে, বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বোঝা গেছে প্রতিষ্ঠানের অনেক পাতা, বুধবারের অনেক সন্ধ্যার চেয়েও কবি ও কবিতাপাঠকদের কিছুটা কাছাকাছি আসতে পারা অনেক বেশি প্রাপ্তিকর। যারা তা পারলেন না তাদের আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। আসলে উক্ত ঘটনাটি এটুকুই শুধু প্রমাণ করছে যে, কবিরা প্রধানত স্ব-শাসিত। আমার মনে হয় তাই তাদের উল্লাস, বেপরোয়াপনা এবং একধরণের আত্মসর্বস্বতা হয়তো গদ্যকার বন্ধুদের আহত করেছে। কিন্তু কবিরা যে সাহিত্যের মানচিত্রে একটা নিশ্চিন্ত মুক্তাঞ্চল তৈরী করতে পেরেছেন এজন্য কৃতিত্ব তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য। অবশ্য আমার গদ্যলেখক বন্ধুরা জেনে রাখুন, তাঁরা নিজেদের যতটা ক্ষমতাশালী বলে মনে করেন, ভুল করেন, কারণ তাঁরা তার চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী। এবং আমার এ আস্থায় এখনও কোনো টোল খায়নি যে তাঁদের ছাড়া আমরা কোন অবস্থাকেই পাল্টাতে পারব না। তাঁদের আহত হওয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ সেইভাবে তাঁরা কোন স্ব-শাসিত অঞ্চল তৈরী করতে পারেননি। কিন্তু এক্ষেত্রে গদ্যকারদের স্বপক্ষে কবিদের টেক্‌নিকাল সুবিধের কথাটি না বললে এই গোটা লেখার মুখ্য বিষয়বস্তুটাকেই ছোঁয়া যাবে না—সেটা হল তাদের লেখার আকার, যা কবিদের চেয়ে অনেকবেশি ফর্মা দাবী করে। এবং এই অর্থনৈতিক সুযোগটুকুকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠান তার নিরেট অপব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পার্থক্যটুকু, যা ঘোচার নয় তা যদি ঘুচে যেত তবে আমি নিঃশঙ্ক যে এতকিছু লেখার কোন প্রয়োজন হতোনা। কিন্তু তবু যে ভয় হয় তাদের ক্ষোভের গভীরতাকে হয়তো বিভিন্ন কোণ থেকে ছুঁতে চেয়েও ছুঁতে পারলাম না, তার কারণ তাঁরাই। কারণ, তাঁরা কথোপকথনের উপর কোন দৃঢ় আস্থা রাখেননি। কিন্তু এইসব ঘটনার সময় থেকে আজ প্রায় বছর দুয়েক পর পর্যন্ত আমার বক্তব্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে, তা হল—এতে ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেকের ক্ষতি হয়েছে। 'আমি না লিখলে কার কি যায় আসে বা বাংলা সাহিত্যের কি ক্ষতি হবে' এই অভিমানের কুয়াশা এত গাঢ় হয় যে ভাল করে তাকিয়ে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অবশ্য তা বোঝার সময় যে পালিয়ে যাচ্ছে আমি তা বলতে চাইছি না, কিন্তু সেই বাবদ কিছু করার সময় বড় দ্রুত অপসৃয়মান। আজ আমরা কি তার লেজও ভাল করে দেখতে পাচ্ছি?

অবশ্য এরকম বহু লেখা আমি পড়েছি, যেগুলি ভাসা-ভাসা প্রতিষ্ঠানবিরোধী, যেগুলিতে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা হয়নি, ফলত অভিমান প্রধান। অবশ্য আমার এই লেখাটিরও মূলসূত্র অভিমান, এমনকি প্রতিষ্ঠানবিরোধী যে কোন লেখাকে প্রতিষ্ঠান যেমন 'লেখকের অখ্যাতিজনিত ঈর্ষা' বলে নাকচ করে দেয় আমার এই লেখাটিও মুখ্যত তাই। অর্থাৎ আমার এই বিষোদ্গার, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই একধরণের ব্যর্থতাবোধ অখ্যাতিপ্রসূত। যার কারণ আমার বন্ধুদের পরস্পর প্রত্যেকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, যে বিচ্ছিন্নতা আমাকে নিস্তেজ করেছে, নিরুদ্যম করেছে, যা এত প্রবল যে আজকাল একটা ছোট লেখা কপি করতেও হাত ওঠে না। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে গদ্যকার মহলে হতাশা ও হতভম্বাবস্থা, যা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানসৃষ্ট। আসলে আমার শুরুর দিকের বন্ধুরা অনেকেই ছিল গদ্যপ্রধান, তারা আজ অনেকেই প্রায় লিখছে না। ছাপবে কোথায়? আর তাদের লেখা না পড়তে পেয়ে পেয়ে আমিও আজ যথেষ্ট মরিয়া, আর তা হবোনাই বা কেন। অবশ্য এসব ছাড়াও আমরা অনেকদূর কিছু না কিছু করতে পারতাম। কিন্তু গদ্য লেখক ও কবিদের জন্য বিদ্যমান দুরকম অবস্থাও অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। এবং এই সবকিছুই একজন সৎ, সেন্সিটিভ্ লেখককে তার নিজের এবং চারপাশের লেখালেখি সম্পর্কে ক্রমশই উদাসীন করে তুলতে পারে। আমি তো কখনই ভাবতে পারিনি আমার একটা লেখা অমিতাভকে না পড়িয়েই কোন বড় কাগজে ছাপা হবে, তারপর অমিতাভ টেলিফোনে আমাকে সেই নিমিত্ত সাধুবাদ জানাবে। আমাদের সিস্টেমগুলোই এরকম ছিল না। আমি কি শিল্পসৃষ্টিতে একাকীত্বের পবিত্র তত্ত্বকে লঙ্ঘন করছি? আমি জানি না। শুধু দেখছি বিচ্ছিন্নতা আমাদের অনেককেই এত উদাসীন করে তুলেছে যে অনেকের স্বাভাবিকতা হারিয়ে যাবার উপক্রম।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মৃত্যুর পর সম্ভবত মহাবোধি সোসাইটি হলে তাঁর একটি শোকসভায় অনেকের সঙ্গে এসেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বেশ কয়েকবছর আগের কথা। আর প্রেসিডেন্সীর আড্ডা থেকে, সিঁড়ির ধুলো প্যান্ট থেকে ঝেড়ে গিয়েছিলাম আমরাও। অনির্বাণের কথা স্পষ্ট মনে আছে। কেন, সে কথায় পরে আসছি। সেদিনকার বক্তৃতামালা বেশ জমছিল। কারণ অনেকের কাছেই, বুঝতে পারছিলাম, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন মানুষ হিসেবে বেশ অপরিষ্কার। এরকম হতে হতে, বক্তৃতা দিতে উঠলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমার স্মৃতি প্রতারণা করছে না আমি জানি, কারণ সুনীলকে আমি তার আগে খুব বেশী দেখিনি। এবং প্রাতিষ্ঠানিক কদর্যতা কিভাবে একজন মানুষের মাথার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় ও ফুটে ওঠে চোখেমুখে—এই রূপ আমার দর্শন সেই প্রথম। এর আগে সুনীলকে আমি বলা যায় ঘৃণা করতাম না। ফলে আমার স্মৃতি প্রতারণা করছে না আমি জানি। সেদিন সুনীল যা বলেছিলেন তা বাক্যগঠনভেদে এইরকম—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সিরিয়াস লেখক, বেশ অন্যরকম লেখক। কিন্তু দেশ-আনন্দবাজার থেকে

তো তাঁকে ওপেন অফার দেওয়াই ছিল। তিনি না লিখলে আর কি করা যাবে। অন্যরকম লেখকদের লেখা ছাপা হয়না এসব একদম বাজে কথা। আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দারিদ্য মহান এই তত্ত্বে খুব বিশ্বাসটিশ্বাস করতেন। একটা বয়েসের পর মনে হয় না বেশ, যে বাসে-ট্রামে বড় ভীড়, নিজের একটা গাড়ী থাকলে মন্দ হত না বা কম জায়গায় গু'তোগুতি করে থাকার চেয়ে একটু হাত-পা ছড়ানো যায় এমন একটা বাড়ী হলে কেমন হতো, অথবা একটা ফ্রিজ থাকলে বেশ ঠাণ্ডা জল খাওয়া যেত—এগুলো মনে হওয়া কোনো দোষের নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এরকম মনে করলেন না। তাই দেশের ওপেন অফার সত্ত্বেও তিনি বেশী লিখলেন না ইত্যাদি। কি করা যাবে!

এইভাবে, দায়িত্বহীন গলায় বিচিত্র শোকবক্তৃতা তিনি হয়তো আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে গিয়েছিলেন। অনির্বাণ আর আমি কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসেছিলাম চুপ করে। সম্ভবত রাগে, সম্ভবত ভয়ে। অনির্বাণের নিশ্চই সেসব কথা মনে আছে। আমার মনে আছে, কারণ একজন সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অপপ্রভায় সেই আমি প্রথম নির্ভেজাল শিউরে উঠেছিলাম! জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমার প্রথম তালিকার প্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন না। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন একজন লেখক, লেখাটা যাঁর কাছে সাহিত্যসৃষ্টির স্তরেই ছিল। তিনি কোনো সচেতন প্রথাবিরোধী বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক ছিলেন না। যখন যা লিখেছেন কাগজ নির্বিশেষেই ছেপেছেন। কিন্তু একটা লেখা তৈরী হওয়ার তাগিদের যে নিজস্ব কাঠামো, সেটাকে কোনো চাপের মুখেই ভেঙে পড়তে দেননি। অথবা তাঁর শোকসভায় বক্তৃতা দিতে আসা পপুলার কাঁপ সাপ্লায়ারদের মতো লেখাকে একমাত্র বাড়ি গাড়ি ফ্রিজ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে মনে করেননি। সুনীল গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার কোনো সরাসরি স্বার্থের সংঘাত নেই। ফলে, সুনীল মার্কেট থেকে আউট হয়ে গেলে আমার উপন্যাসগুলি টপাটপ বিক্রি হবে এই ধারণার ওপর ভিত্তি ক'রে, সুনীলকে হেয় করবার জন্য আমি উপরোক্ত উদাহরণটি দিইনি। অবশ্য নিজেদের হেয় করতে তাঁরা নিজেরাই যতটা সক্ষম হয়েছেন আমি ততদূর পারব না স্বীকার করছি। আমি উদাহরণটি দিয়েছিলাম শুধু কি বুঝিতে ও কি ধারণায় বাংলাবাজার চলে তা বোঝানোর জন্য। আমি আবার বলছি আমি সেদিন শিউরে উঠেছিলাম, কিছু লেখার জন্য আমি ছটফট করেছিলাম। কিন্তু কিভাবে, কি বলবো ভেবে উঠতে পারিনি। সমস্ত অবস্থাটা বুঝে উঠতেও আমার একটু সময় লেগে গেছে। কিন্তু আজ একটা সামগ্রিকতার মধ্যে দিয়ে সেই নক্কারজনক বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার তুমুল প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমি এই লেখাটির শুরুতে যা বলেছিলাম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানবিরোধী নানান গালগপ্প আমরা কম ছোটোবেলা থেকে তো শুনছিনা—এ প্রসঙ্গেও আমার কিছু বলার আছে। বাগবাজার স্ট্রীটের মোড়ে, চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে—বহুবছর আগেকার কথা—শিশু প্রবুদ্ধ ও শিশু আমি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার তত্ত্ব। প্রতিষ্ঠান-কাঠামো থেকে একটা একটা

করে স্ক্রু কি করে খুলে নেওয়া যায় ইত্যাদি। অনেকের মতো সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আমার কাছেও ছিলেন একজন উজ্জ্বল, ব্যতিক্রমী লেখকচরিত্র, যাঁকে আনন্দবাজার লেখক করেনি। এবং যিনি নিজের লেখার প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ অসম্ভব ভালোবাসায়, সৃষ্টিশীলতার জায়গা থেকে লিখে থাকেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ যেন কে বা কারা—সম্ভবত 'পপুলার কপি-সাপ্লায়ার'-দের মহল থেকে—রটাতে লাগলো 'সন্দীপন তো না লিখেই লেখক।' অর্থাৎ বছরে চারটে কেঁদো উপন্যাস কই! আসলে তরুণ মহলে সন্দীপনের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অনেকেরই ভাল্লাগছিলো না। তাই এই রটনা। আর পাবলিক দেখলাম তা খেলোও। সন্দীপন তার কম লেখার সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম বলে বলে ঘুরতে লাগলেন, যে সবের কোনো দরকার ছিল না। দরকার ছিল খুব শান্তভাবে লিখিত আকারে সবিশেষ ঘুরে দাঁড়ানো, দরকার ছিলো একটি সংগঠিত সামাগ্রিক চ্যালেঞ্জ। এরপর দেখলাম জীবনানন্দউত্তর বাংলা কবিতার সবচেয়ে বৃহৎ, উজ্জ্বল দুটি প্রক্রিয়াকে, যাঁদের নাম বিনয় মজুমদার ও উৎপলকুমার বসু। এঁদেরও আনন্দবাজার কবি করে নি। দেখলাম শঙ্খ ঘোষকে, যাঁকে দেখে সব সময়ই মনে হয়েছে ইনি সব ব্যাপারটাই বুঝছেন ও এবার কিছু বলবেন, কিন্তু তাঁর নিথরতা, তাঁর নৈঃশব্দ্য কচ্চিৎ ভেঙেছে! একমাত্র বিনয় মজুমদারের কথা আলাদা বাকী। সবার প্রতি আমার অভিযোগ অতি সরাসরি—এঁরা এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। মাঝেমধ্যে আড্ডা ইত্যাদিতে এরা বিরোধী কথাবার্তা বলেছেন বটে, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করেছি যাকে বলে ওঠা ব'লে, যাকে দান উল্টে দেওয়া বলে তা সামগ্রিকভাবে লিখিত আকারে কোনোদিই তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। গেলে অবস্থা আজ অন্যরকম হতো। আসলে বহু ডামাডোলের মধ্যে তাঁরা নিজেদের জায়গাটা ভাল করে বুঝতে পারেন নি। বোঝেন নি যে তাঁরা আসলে কী। তাঁদের প্রত্যেকের ওজনই ছিল আনন্দবাজারের সামগ্রিক ওজনের চেয়ে বেশী। তাঁদের কথা বলার দরকার ছিল। এ দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না। তাঁদের যৌবন সময়ের মধ্যেই মাত্র প্রতিষ্ঠান জিয়ো থেকে সাংস্কৃতিক দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের অসহায়তায় তাঁদেরও অবদান আছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো অবদান আছে বোধহয় প্রকাশকদের, যারা প্রায় আনন্দবাজারের লেজুড় হিসেবে কাজ করেছেন। হ্যাঁ, বিভিন্ন মননশীল প্রবন্ধ তাঁরা লাইব্রেরী সেলের জন্য ছেপেছেন বটে কিন্তু ক্রিয়েটিভ লিটারেচার? সেই লেজুড়বৃত্তি, সেই প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাম্প দেখে দেখে বই ছাপা, সেই বাজারী মাল ঠেলে চালান। পাব্লিকেশনগুলো যেন খবরের কাগজের সেকেণ্ড ফিড্‌লু। খবরের কাগজ স্টার বানাবে, আর সেই স্টারদের, খবরের কাগজকে দেওয়ার পরের যে উচ্ছিষ্ট তাই নিয়ে ব্যবসা করবে প্রকাশক। খবরের কাগজশাসিত সাহিত্যের বাংলাবাজারের এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে নিয়ম। এই নিয়ম মেনে নিয়েই, লেজুড়বৃত্তির মানসিকতা নিয়েই মেদিনীপুর গোবিন্দপুর থেকে এসে করে খাচ্ছে কিছু তৃতীয় শ্রেণীর লোক, যারা লোহালক্কড়ের ব্যবসাও করতে পারত। অথচ ভাল লেখা ছাপার পরিস্থিতি

সবসময়েই আছে। নবপত্রের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য স্তূপের মধ্যে থেকে উঁকি মারতে দেখলাম সন্দীপন চট্টোকে। তাঁর বই শুনলাম ভালই বিক্রি হয়েছে, শুনে ভাল লাগল। প্রসূন বসুকে ধন্যবাদ। অবস্থাটা এরকমই উজ্জ্বল হওয়ার কথা ছিল। প্রকাশকদের উচিত ছিল খবরের কাগজের হাত থেকে ইনিসিয়েটিভ ছিনিয়ে নেওয়ার। হয়নি। পৃথিবীতে সাহিত্যবাজার সর্বত্রই আছে। কিন্তু কোথাও তা খবরেরকাগজশাসিত নয়। অথচ অবস্থাটা একসময় এরকম ছিলনা। প্রকাশকরাই ছিলেন, বসুমতী বা ভারতবর্ষের পাশাপাশি, জনরুচির নির্ধারক। ১৯৪২ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে চিঠিতে লিখছেন "... ভাল করে বিবেচনা করে দেখলাম চাকুরী ছাড়াই আমার পক্ষে সঙ্গত। কাল এ সম্বন্ধে প্রবোধ সান্যাল ও গজেন মিত্রের সঙ্গে কথা হোল। ওরা বলে বারাকপুর সস্তার জায়গা এবং কলকাতার নিকটে। ওখানে বসে লিখলে এবং কলকাতায় বইয়ের দোকানে দিলে আমার যা আয় হবে তা বর্তমান আয় অপেক্ষা কম নয়। আমার বর্তমান আয় বছরে ২৫০০ টাকার বেশী নয়। স্বাধীনভাবে যদি ঐ টাকাটা পাই—তাতে কলকাতার খরচ লাগবে না—অথচ ভাল ও খাব থাকব। স্বাধীনভাবে থাকলে লেখার দিকও ভাল হবে।" এখন, এ উত্তর আমাদের খুব দ্রুত পাওয়া দরকার যে আজ একজন লেখক কেন শুধুমাত্র 'বইয়ের দোকানের' ভরসায় স্বাধীনভাবে লিখে যেতে পারেন না।

আসলে আমার এই লেখাটি, সংক্ষেপে, তাঁদের প্রতি আমার সেলাম, যাঁরা প্রতিষ্ঠানকে শত্রু হিসেবে চিনেছেন ও সেই অনুযায়ী নিজেদের যৎক্ষুদ্র জায়গা থেকেও তার বিরোধিতা জারি রেখেছেন। 'স্বীয় ভবিষ্যতে' আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রইলো উজ্জ্বল।

আর্থিক কারণে নিত্য মালাকারের বই

এই অবিরল বেঁচে থাকে

২৫শে বৈশাখ প্রকাশ করা সম্ভব হলোনা

জহর সেন মজুমদার

করোটির অভিনেতা

শেষ নৌকায় র‍্যাবোর সন্ধ্যা উঠে আসে
ভয়াবহ লাগে নাভিবর্ণের কুসুম
হলুদ হয়েছে গ্রহণীয় কাঁটাতারে
লিবিয়ার শ্যাওলাদাম, লজ্জার মদে
ডুবি আমি, খুঁজি প্রাণ, মাংসের জীবাশ্ম
আরেক নতুন পথে টেনে নিয়ে যায়
নীল হয় প্রজাতির মহাশূন্য বায়ু
নীল হয় উল্কাপিণ্ড ঈশানকোণ

আমার যজ্ঞের পাশে মাছের আতঙ্ক
নির্মূল হোলো। ইন্দ্রিয়ের রেণু নীলিমা
কেঁপে কেঁপে ওঠে। তমসার ভাসানে
মাতাল কাঁটাগাছ কালো চিমণিরূপে
লাফ দেয় স্নায়ুর জাহাজে। শ্বাসরোধী
যক্ষপুরী আমার ভিতর ঢেউ গড়ে।

আমি মুঠোর চরাচরে গমের দানা
সাজাই। ঘুমহীন লুণ্ঠনে ক্ষণকাল
মেঘচারী হই। ওগো নেস্টর, দেহের
ঘাম মুছে দিব্য স্বর্গপ্রবণতা থেকে
কূট পুতুলের নাচে সুচতুর শব্দে
নিজের ঘুমপাহাড় তৈরী করো। আর
প্রণয়ের চাঁদ নাও, পাণিগ্রহণের।

সুন্দরী হেকামেদ তোমার সোমরস
এনে দিয়ে খুলে দেবে স্তনের পাঁপড়ি
তোমাদের পানপাত্রে হেকামেদ ভ'রে
দেয় গ্রামদেশীয় মদের কবুতর
কিছু ছাগদুগ্ধ আর রক্তগুঁড়ো থাকে
এই কুসুমের বনে। হেকামেদ জানে
সফলতা। ডানাকাটা পরী হোয়ে ওই
যোনির হরিণীগুলি বাণিজ্যের নদী
যেন হয়। ওগো নেস্টর, শিবরাত্রির
বাসি তারা চোখের মধ্য থেকে সরাও।
লোহার মুকুটে প্রেম রাখো। কোমরের
ঘাম দিয়ে তৈরী করো কারখানা মদ।
নিরাকার পাদ্রী নও তুমি। কেনো নেবে
কুঁজো হাস্যরোল ? মৃত গাভী ঘোড়া চিনে
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তোমার জংলী চশমা
শ্যাওলার বাইবেল ঘুমায়। কঁষিত
হয় কর্পূরদরজা। ঢাকের অসুখে
শেষ হয় কামবোধ। নতুন মানুষ
মহাপূজার চিতায় ওঠে। দাসপ্রথা
কে চায় আজো ? শরবতের মহাদেশ
নিভন্ত লণ্ঠনের নিচে পুড়ে গিয়েছে।

শেষ নৌকায় র‍্যাবোর সন্ধ্যা উঠে আসে
বেশ্যার কেশের প্রেমে গর্ভের বন্দর
দেখাও। রাত্রির টুপিতে আনো পায়রা
আর যুবক কবির মতো নাচো নাচো
আর নাবিক ছুঁচের মতো নাচো নাচো
তোমার কালো জিভের গিরগিটি নিয়ে
কাঁটাঘরে কাঁচের পোকায় নাচো নাচো

নাচো নাচো রোদঝরা কাঁচের পোকায়

একদিন তুষারপাতের কিসমিসে
চেনা নাভির হলুদ কুসুমে কুসুমে
ফিরে এসে দেখো সাজানো চরণমালা
মাতালের ঘর বাড়ী সবুজ নীলাম

তুমি হবে নিগ্রোদের নেস্টর। পুষ্পক
রথের লালঠোঁটে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া
আর কামজ্বর নিয়ে শুয়ে থেকো তুমি।
কুয়াশা নির্ভর সবকিছু ভেঙে ভেঙে
সর্পের বাতাস আসে খাটের শাসনে
লোকজীবিকায় বৈধ নড়ে ওঠে ঘর
ভোগের লিপিতে নাচে যুদ্ধক্ষেত্র শ্যাম
ভোগের বৃষ্টিতে নাচে শান্ত ঋতুচাপ

হেকামেদের স্নানঘর থেকে তোমার
বুনো কাঁটাগুলি অধর্মের তপোবনে
নিয়ে এসো। তারপর বাণিজ্যিক পূজা
শুরু হোক। মহুয়াবনের দিকে গ্রীবা
তুলে সূর্য প্রতারণার আয়তক্ষেত্র
চিনবে। চিনবে। সিন্দুকের প্রস্রজীব
বাজাবে করতালির ঢেউ। ইহজন্ম
প্রেমিক পশুদের হত্যার ভূমিকায়
হৃদয় মেশাবে না। লাজুক খরগোশ
ছুটে এসে চুমু দেবে উরুর ধনুকে।

রাত্রির চাপের মধ্যে ঘাসের বীণারা
বাজে। শালবনে নেমে আসে ভারী চাঁদ।
শূন্যের বারান্দা থেকে ঘাসের ঢালুতে
মেষের সভ্যতা গড়ে ওঠে। অতীতের
কথা বোলে যায় বটের লাল বাকল।
পায়ে বাঁধো লজ্জার পরীদের। প্রকোষ্ঠে
ভয়াল মরুভূমি চাই না বারবার।
লবণের স্মৃতি থেকে উঠে এসো তুমি

মাথার ডানায় সব বন্ধনের জাল
আর চুল আর চুল কতো শত শত
জাহাজবাসীর কাপুরুষ পাগলামো
এখনো কি কোরে ভালো লাগে? কঙ্কালের
হাড় হাতে নিয়ে সমস্ত গহনা খুলে

রমণীরা উপমার শ্মশানে আসছে।
প্রকাণ্ড সান্ত্বনা পেতে পারমাণবিক
যুদ্ধ বাধে। ঘরের মোমবাতিতে জন্ম
হয় আবার পৃথিবীর। মৃত্যুর ব্রতে
অসিযুদ্ধে মাতে ভাসানের কানপাশা।
উত্তরে পালাবে তুমি দক্ষিণে পালাবে
আতঙ্কের হিরন্ময় প্রাসাদে লতিয়ে
উঠছিল জরা ব্যাধি মৃত্যুর যৌবন
ক্ষয়ে যাবে ডুবজল বুকজল মেঘ
অন্তরীনের করাতে আর্তনাদ করো—
রক্তের খোঁয়াড়ে পিষে আর্তনাদ করো—

রক্তের খোঁয়াড়ে স্বপ্নে আর্তনাদ করো

জঙ্গলের পথে পথে যোনি মহাদেশ
জঙ্গলের পথে পথে যোনি মহাদেশ

অর্ধেক প্রাণে মাটির ঝুরঝুরো ডানা
লেগে থাকে। মধ্যরাত, মধ্যরাত কাঁদে।
বিকৃত ঘোড়ার লোমে জরায়ু মুনিষ
তুমি নেস্টর নেস্টর! জরায়ু মুনিষ
তুমি স্নায়ুর মাটিতে তরঙ্গ বুনেছো।
সমুদ্র নীল হবে যোগাযোগের ভ্রূণে
সমুদ্র ঘুমাবে চোখ চেয়ে। যক্ষিণীর
কোটরে কোটরে শান্ত হবে সহবাস।

গিলোটিনের পাশে নাব্যতা বেড়ে বেড়ে
অন্ধ কোষের ভেতর নাচে জবাফুল
চণ্ডক্রোধে ধাতুরস নেমে আসে হিমে
আঁশের গোপন বন্দুকে তনুশরীর
পুষ্ট হোলো। অশালীন শ্বাস টেনে টেনে
লাল ঘাঘরার বিবাহের ঘামতেল
জমাট বাঁধে নিষ্ঠুর পদতলে। বিষ
চাপ বিষচাপ কুঞ্জের ছবিতে নামে।

বাঘের থাবা জুড়ে চকিত কাকাতুয়া,
শেষ হয় চন্দনের দিন। ছায়াময়
অস্ত্রের আজন্ম তাড়নায় মৃত ঘ্রাণ
পাথর হয়েছে। হলুদ ঘিলুর পুঁজ
পেষণে পেষণে টানে আসক্তির দিকে।
রমণের গোঙানি থেকে সাপেরা কাঁদে
রতিগাছ নগ্ন হয় শরীর মুচরে।
শূন্যগ্লাসে রতির নির্বেদ ঢালো ঢালো।

থ্রেসিমেদিসের ব্রোঞ্জনির্মিত উজ্জ্বল
বর্শাটি তুলে নিয়ে বাইরে এলে তুমি।
যুদ্ধের কৃষিভূত ফুলময় পরাগে
অন্ধকারের নিচু সর্পশাসনে ঘুন
আর হবে না তোমার। রক্তপিশাচীর
কৃষ্ণগ্রাসে মৃত্যু হয় প্রতিটি বীরের।
ঘুমন্ত কলঙ্ক পর্বতের অন্তর্বর্তী
পুরাণে প্রদীপের আলো ঠিকরে পড়ে।

অর্থহীন শামুকের অনিবার্য জিভে
গুটিয়ে আসে সতর্ক দেবতা। যবন
লিপির শাসনে নষ্ট হয় ঋতু। আর
তোমার পাকা চুলের সভ্যতা করঞ্জা
নৌকার ভিতর দুলে ওঠে। নিরক্ষর
চলচ্ছক্তি শূন্য হোয়ে যায়। আর তুমি
নির্বাক দ্রষ্টার মতো শূন্যে চেয়ে আছো।
বসন্তের ছেদযতি লক্ষ্য করো একা
বসন্তের ছেদজ্যোতি তোমার উষ্ণতা ?

মাঘরাত্রি স্বাদ পায় ঘনিষ্ঠ হবার
উপবাসী একা তুমি মাঘনীলিমায় ;
যূথবদ্ধ কথাবার্তা নিয়ে সভ্যতার
হিল্লোল চেনো। অসুখ বাড়বে বাতাসে।
আরোগ্যের গতিবিধি ঘুরছে শহরে।
উপকূলবর্তী জাহাজ থেকে নেমেছে

আহত হোয়ে নত ডাওমীডস। আর
পাশে এ্যাগামেনন। সঙ্গী ওডিসিয়াস।
সহায়তা চাই, ভালোবাসা চাই, দেবে ?
কে দেবে ? নেস্টর, তুমি ? মৌসুমী বাতাস
শুধু বয়ে যায়। স্মৃতি বেয়ে, সিঁড়ি বেয়ে।
অন্তের ব্যারোমিটারে এসেছে বিপদ।
যুবকদের হয় আজ প্রাবের লজ্জা।
স্বপ্ননালী কেটে-গিয়ে দেখা যায় ঘৃণ।

সূর্যাস্তের সিম্ফনী গরিষ্ঠ হোলো আজ
ফুসফুস জুড়ে ভয় পশমে প্রণয়ে
স্বর্ণমুদ্রাগুলি ভোবে বর্ণের ভূগোলে
আবর্জনার ফাটলে কপ্রছায়া নামে,
মূর্ছনার হরফগুলি কালো হয়েছে।
রক্তগমনের চিমনিতে মানুষের
বয়ন শিল্প আর নেই। ঘুমের নুড়ি
উঠে আসে আণবিক বুকের ভিতর।
ঝাপটে ঝাপটে নেস্টর অশ্লীল তুমি
হেরে যাবে। কালিমার হিম প্রাণে প্রাণে
অণুমাত্র বিদ্যা নিয়ে কোথায় পৌছাবে ?
দাঁতের তরল চিল অমঙ্গল চায়
গ্রথিত মুহূর্ত নিয়ে মৃত্যুর বিছানা
টান দেয় ঝুঁটি। করোটির অভিনেতা
কাগজের শিকলে যান্ত্রিক হয়ে আছে
বুড়ো আঙুলের কার্বণে গা পাক দেবে
আদি ভাষার গ্যালারীতে ফেণার তৃণ
পাকে জড়াবে। তোমার কিছুই হবে না।

হননের জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে একাকী
শরীরের তাপ থেকে লোমগুলি খুঁটে
রক্তিম ঝিনুক থেকে ঘোলটুকু নিয়ে
স্বাস্থ্যের গোপন কান্না শুনেছো। শ্মশানে
নোনা বাঁশী বেজে ওঠে বারবার। ছাঁচে
ঢালা মাকড়শার বাড়ীর মতো তুমি
ভঙ্গুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে খিদের ঘণ্টা
বাজাচ্ছ। ইস্পাত ঝলসে ওঠে ধূসরে।

বুকের পাপিগুচ্ছের শোভা মরুভূমি
হোয়ে মূলের ছাই ছোঁয়। আর তোমাকে
কৃশ লাগে খুব। গাছপালা ইন্দ্রমেঘে
কুকুরের শীত কামড়ায়। ইঁদুরের
এই যুদ্ধ। লম্পট নাবিকের সৈকতে,
গণিকার হাড়ে, জুয়ারির সমকামে,
পর্তুগীজ চাঁদে সিন্ধুজল উঠে আসে।
ছেনাল ঋতুর চাষে ঘৃণিস্রোত কাঁপে।
যুদ্ধের পোকারা খায় কুমারী কোরক।
সোনার কাকপক্ষীতে তোমার চোয়াল

ছিঁড়ে খাবে। কার্পাসের ঝড়ে নীলজলে
মেঘের খলিফা তুমি ভেসে ভেসে যাবে।
কাতর যুগের ছদ্মবেশী খুনী ক্ষুর
চালাবে তোমার তলপেটে, চামড়ায়।
কবরের ওপর মন্ত্র নিয়ে ওঝারা
ডাকবে তোমায়। শব্দগুলি ঝলসাবে।
মাটির ধমনী খুলে দেবে অন্ধকার।
পরমাণুর প্রদেশে আদিঘুঘু ডাকে

পাপের বিনুনি নাচিয়ে চুক্তিঘুমের
চরসে নগ্ন হয় কুষ্ঠরোগীর দেশ।
অন্ধকূপের ভাপ এসেছিল উনুনে,
জটা পড়েছে তোমার চুলে। মাতালের
মতো লাগে তোমায়, নেস্টর ; লালাময়
নগরের বঁড়শিতে বিঁধে আছো তুমি।
ভারসাম্যের ফুল চাই পেশীর টানে—
সুড়ঙ্গের পূতিগন্ধে বিঁধে আছো তুমি।

খয়েরী শূন্যতা আসে মাথার ভিতর।
রৌদ্র চেয়েছিলো কৃপাণ আদি ভূগোলে
সরলরেখার মধ্যে লুটোয় দুপুর
কালো সনেটের শীত এনেছে রোদন
বৃদ্ধের রক্তচলাচলের জাতীয়তা
আজ তোমার দিকেই ধাবিত নেস্টর।

বহুদিন পরে লিখতে লিখতে শুধু
অলিগলি বেশ্যালয় ঢু'ড়ে কুমারীর
গাউনের ভিতর শ্বাস টানি। তোমাকে
মনে পড়তে থাকে, নেস্টর। বারবার।
ঘুমের দর্শন থেকে প্যারাসোলহীন
রহস্যের ছায়া তাড়াতে তাড়াতে সূর্য
দেখি নগ্না দেখি জন্মসড়কের ব্রীজে।
নেস্টর নেস্টর আমি চীৎকার করি।

নেস্টর নেস্টর আমি হাহাকার করি

বহুদিন পরে লিখতে লিখতে শুধু
টেবিলের নিচে আর চেয়ারের নিচে
মুখ গুঁজি। অমঙ্গল যন্ত্র নই আমি।
নেস্টর, নেস্টর, চৌকিদার হোয়ে আছি,
কামড়ানোর বিদ্যা নেই আমার। তুমি
আমার জিভের তলা থেকে উঠে এসো।
কালো সনেটের শীত এনেছে রোদন—

নর বিন নাহি চিন কেতাব কোরাণ
নর সে পরম দেব তন্ত্র তন্ত্র জ্ঞান
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান
দৌলত কাজীর এইসব স্পষ্ট কথা
শুনতে পাওনি তুমি ? নৈর্ব্যক্তিক জলে
অনিশ্চিত নরকের শব ভেসে যায়
নর বিন নাহি চিন কেতাব কোরাণ

তোমার মতোন বৃদ্ধ আমার দেশেও
আছে, নেস্টর। রক্তে নুনে ঘামের সঙ্গে।
দুর্গে বন্দী সাজাহান দেখেছে এমন
ক্রমাগত রক্তক্ষয় পুত্রকলহের।
দারার কাটামুণ্ড থেকে বার হয়নি
কোনো ক্রুর প্রজাপতি ; আলোর অপেরা ;
ঘামের ফোঁটার মতো রক্ত চু'ইয়েছে

আমাদের মাথার উপর। ট্রপিক্যালে
রক্ষণশীল ধর্মের শৈশব ঝরেছে।
মেধার চাঁদে বোবা পণ্ডিতদের মতো
বর্ণচোরা রোগের ফাল শাণিত হয়।
মগজের সাময়িকপত্র মাথা কোটে
ইতিহাসের গণ্ডগ্রামে। মৃদঙ্গগীতি
কার? পটভূমি কার? রাজনীতি শিস
দেয় শুধু। ভাষার সিঁড়ির নিচে অভ্র
ভাষার সিঁড়ির নিচে নদী, শঙ্খমালা।
সাইকেল আরোহীর মতো অর্বাচীন
কল্লোলের ঢাকনা তুলে আমরা মাতি।
রাস্তা ধ'রে সামনে যাই। দেবদাসীর
সমুদ্রকড়ির কথা ভাবি সন্ধ্যাবেলা।

একদিন যযাতি যুবক হয়েছিল;
পুত্রের পুরুষচিহ্ন নিয়ে কেঁপেছিল
তার নতুন ঘড়ি। নিশ্চুপ রক্তজবা
ঘোর কামড়ে কামড়ে ভেঙেছিল তাকে।
যযাতির তোষকের দিকে ব্রতকথা
নিয়ে কেনো যাবে নেস্টর? তোমার ছবি
আত্মনাশের অলীক পিপাসার নয়।
পুরুষ উজ্জ্বল হয় তাম্রলিপ্ত মাঠে
যেখানে দীর্ঘ সব গাছ চন্দ্রগ্রহণে
চাষার মাথার মতো লাগে। মনে হয়,
পিতলের থালা যেন ভৈরবের মাছ;
ভোগের অলঙ্কারে কেঁপে ওঠে পাষণ্ড
যযাতির বুনো জেব্রার উন্মাদ ঘাই
নেশাতুর মজ্জা নিয়ে এইভাবে ব্যর্থ
সেই বৃদ্ধ—তোমাকে টানছে নাকি স্বাদে?
নেস্টর, শোনো, রজনীর শাকান্ন খেয়ে
তিমিরসঙ্কুল এক নিঃশব্দ জর্নাল
লিখে রাখো বরফের পরাগ মাখিয়ে;
তুমি অণু হোলে সূর্যনৌকা ভেসে যাবে
অনন্ত কুয়োর দিকে মুখরতাহীন।
তুমি অণু হোলে বর্ষার সুন্দরী শুধু
শোবে তোমার কোলে। চক্ষুতে চন্দ্রবোড়া

নাচুক না-হয় আজ। শীতল পুকুর
আরো শান্ত হোক। তৃতীয় খাদের দিকে
নেমে আসছে বোকা পেটের বাচ্চাগুলি।
ডাইনীরা ঘিরে আছে যযাতির বিষ
নেচেছে গ্রহকাদা মস্তিষ্কের আনন্দে
এমন বিষের পাত্রে কি কাজ তোমার?
স্বপ্নের নালীতে কাঁটা বিঁধিয়ে নেস্টর
তোমার উজ্জ্বল চিরকুট তৈরী রাখো।
সৌরজগতের পাশে পার্থিব মানুষ
হোয়ে উরুমুদ্রার মালগাড়ী কাঁপুক

মৃত্যুর পিপাসা পাবে খুব মানচিত্রে
নীলবড়ি লালবড়ি ডাকবে তোমায়
ফালাফালা অন্ধ স্বদেশের কানামাছি
ময়দার আঠার ভিতর টেনে নেবে
শিরাটানে ফুরোবে সব টগরমাটি
উলঙ্গ খনির ঘোড়া ভেঙে দেবে ঘর
বেঁকে যাবে দেবতার মুখ লিনোকাট
রাত্রির বিমানে চড়বে শ্বেত পায়রা
আর তুমি আমাদের ষড়রিপু হবে

আর তুমি আমাদের বৈমানিক হবে

আর তুমি আমাদের গুপ্তচর হবে

বন্দরে ভ্রমণের ক্রেন নেমে আসছে
নেশাতুর কুঁজো বোকা তুমি সৌরপ্রেম
নেশাতুর কুঁজো বোকা তুমি সিন্ধুরস
বেঁচে থাকো উল্লাসের লাল তরমুজে
চূড়ান্ত বিভার তৃপ্তি আলেয়ার কামে
বেঁচে থাকো মদ আর নষ্ট ভিজে চুলে
নর্দমার বমন থেকে মাকাওনকে
বাঁচিয়েছো তুমি। নারকীয় শিল্প-লাস্য
আর অস্পৃশ্যার অঙ্কুর নরমেহনে
মাতে। কীর্তির চিহ্নের দিকে রণধ্বনি

নিয়ে বারবার ইউরিপাইলাসের
জানু থেকে তীর টেনে বার করো তুমি।
যুদ্ধের বাণিজ্যে আর যেয়ো না নেস্টর
আত্মার শঙ্খগুলি বেশ্যার ঋতুচক্রে
জমা দেবে কেনো ? কোটি নক্ষত্রের অন্ন
খেয়েছো। আত্মার মুদিখানা বোবা ক্লেশে
ডোবে। এনিসবাসীরা তোমার অতীত
জানে। তুমি ছিলে নিষ্ঠুর, স্ফীত অর্ণব,
তুমি ছিলে গাণিতিক ঝোড়ো হত্যাকারী
আজ উটের আদলে শতাব্দীর সাঁকো
বেঁকে গেছে। শূদ্রস্রোতের কেচ্ছা শরীর
এখনো ভালো লাগছে ভাবতে পারি না।
যুদ্ধের উজবুক চুম্বকে কামাচ্ছন্ন
ঐকতান নিয়ে যাবে নৈরাজ্যের দিকে।
রক্তের হরিণ অক্ষরের শীৎকারে
পর্ণজীবী হয়। পৃথিবীর স্বেচ্ছাচার
বাঁজা গোরস্থানে জমা রেখে যৌনশুল্ক
কেনো খোঁজো ? সামুদ্রিক সাম কলরবে
ঝড় আসে বিতৃষ্ণার ক্যারাভানে। তুমি
অতীতের রণক্ষয় থেকে ছোবলের দিনগুলি
পাইলস থেকে ছোবলের দিনগুলি
ভুলে ফেরো আমাদের দিকে। রমণীর
বোতলের জলে রাখো শ্রেষ্ঠ স্বাতীতারা।
কামার্ত কাপ্তেনের মতো জেগে উঠুক
বিবিধ কুহক, মুর্খের রোবট প্রভু
যদি ফিরে আসে গূঢ় অমৃত যোনিতে
যদি ফিরে আসে গূঢ় বন্দী কচি তৃণে
আমরা তোমার কথা মানবোনা আর
গর্ভের দানব হোলে আধার মানসে
আমি তোমাকে নিয়ে আর কোনো কবিতা
লিখবো না। শ্বেতসার বাঁজজুড়ে থাকো।
প্রণামের রূপালী কম্পনে মক্ষিকার
নক্ষত্র পিতার ভূমিকায় স্বচ্ছ থাকো।
সূর্যমুখী পাখীর মাতৃত্বে গড়ে তোলো
অমৃতের নিগ্রোপল্লী। ভিক্ষুবেশ নয়।
স্বৈরিণীর আমিষ স্রোতে ধূর্ণিত কুশে

আছে বন্দীশালা। ভাঙো তাকে। ভাঙো তাকে।
পাতালপুরীর কক্ষপথে শয়তান
দাঁড়িয়ে থাকছে আজো। বধির ব্রহ্মাণ্ড
তোমার শরীরের মাদক অনাচারে
অন্ধ হবে। খুলে রাখো বকলস-কীট।
রাত্রিকণার রতিলীলায় দীপ্তলীলা
বসে। দেহরেখা ভোজ খায় শুধু। আর
ঋতুময় মলমের সরাইখানায়
সততার ঘড়ি ঘোরে না। সোঁদা কাঁচুলি
ঘেয়ো বন্দরের পাশে লোকাচারে জাগে।
তোমার মতোন বীর এইদেশে ছিলো
মহাকাব্যের গণিকা দ্রৌপদীর কূপে
কিন্তু আজ সব মূক পোড়ো বাড়ী যেন ;
প্রাচীন জামার চাপচাপ রক্তছিদ্রে
বাঘিনীর কামকলা শেষ হয়ে গেছে।

সৈনিকের মৌলরূপে জেগেছিলে তুমি ;
পাঁজরের বেয়োনেটে ধূর্ত গতিপথে
গিয়েছিল বহুবার। কবির বিশ্বাস
নিয়ে আজ ডাকছি তোমায়। নাড়িঘাণে।

আমার পিতার নাম নেস্টর নেস্টর
কালো মাছি জেনে গেছে, জানে জলপিপি,
শতাব্দীর লণ্ঠনে জ্বলছে আলোকণা
শতাব্দীর পাঁজরে জ্বলছে আলোকণা
কালো মাছি জেনে গেছে, জানে চর্যাপদ,
আমার পিতার নাম নেস্টর নেস্টর

গাধার পিঠের থেকে লবণের বোঝা
নামিয়ে আমার বারুদের দিন শুরু
বায়বীয় কামানের পোড়া গলিপথে
সমস্ত দুর্যোগ ভেঙে বাইরে এসেছি
ফুসফুসের মুকুরে নাচে জৈব সূচী
অ্যামিবার জঙ্গী কাঁথা জঙ্গলে শুকায়
আজ থেকে স্নানঘরে নগ্ন প্রতিচ্ছবি
রেখে আমি চিন্তার ডিভানে একা শোবো ;

উরুসন্ধির আরকে নিরুদ্দেশ মেঘ
এসে ডেকে নেবে পিতৃতন্ত্রের মেশিনে
শিরা থেকে কুঁড়িগুলি ঝরাবেনা আর
মাথার ভিতর তৈরী করি পানশালা
আমার কোটরে থেকো নেস্টর নেস্টর
বাহ্যজ্ঞানে মন্ত্র দিয়ো তালুতে মন্দিরা

তারপর কাকেদের অস্পষ্ট সৈকতে
আমি তুমি অথৈ জলে দুত ডুব দিয়ে
সীমিত খাদ্যের দেশে খুঁজে নেবো বীজ
ফাঁদ থেকে কর্মসূত্রে যাবো দুইজনে
বনছায়া, কৃষিছায়া নৃত্যনাট্য করে
বনছায়া, গীতিছায়া নৃত্যনাট্য করে

বনছায়া, রাতছায়া আমাদের ডাকে

যুদ্ধের কৃষ্ণপক্ষে যা কিছু ধ্বংস হোলো
স্নায়ুমূলে গড়ে দিতে হবে জীবিকায়
ঢালু পাড়ে নেমে যায় যৌন সন্ধ্যাসাপ
মারবোনা আর তাকে। সবুজ মর্মরে
আমরা মোরগের অদৃশ্য পৃষ্টদেশ
খুঁড়ে নিয়ে আসবো নবীন জন্ম ফের।
প্রেমের বিজ্ঞানে দেখো নাচবে প্রবৃত্তি।
পিতা, তুমি আমার গীতিনাট্যের বেণী।

দার্শনিকের স্বাধীনতায় পুরুষের
কৌণিকতা যেন ধোলাজলে ধ্রুবতারা,
তুমি তার অলৌকিক প্রমাণ প্রতীক
আমার পিতা রহস্যের সকাল-সন্ধ্যা ;
আমার পিতা নগ্নতার ক্ষরণ-বিভা
আমার নিয়তি আজ তোমার বিভায়
মনোরম। রক্তছালে আমি নগ্ন হলে
যৌন বিমানবন্দরে ভর করো তুমি।

লম্পট রাক্ষস পদ্যে আমি তুমি নেই
মাটির উগ্রতা মেখে হাঁটু গেড়ে বসি

কুমারের হাড়ে আসে পুরুষালি রথ
ঘটনার তেলকালি বারবার ডাকে

শতাব্দীর আকাশে জাগলো পূর্ণ ওষ্ঠ
তোমার আমার। উটের করুণ চোখে
বর্ণমালা সেজে ওঠে, নদীতে রোদ্দুর ;
লণ্ঠন উপচে আসে রাত্রির আঁচড়
শেষতম কবিতার ঘরে অনিবার্য
ঘোড়া ছুটে যায়, দোর বন্ধ থাকে। দুত
জ্বলে শকুনের চাঁদ। উনুনে পৌরুষ
পোড়ে শুধু। আমি তুমি যৌথ ঘ্রাণে থাকি।

পুজোর থালার মধ্যে থাকে ঘুমতেল।
নিতম্বরেখায় কাঁপে ব্রহ্মময়ী সাধ
স্থলভাগে জল নেই জলভাগে স্থল
সর্বজ্ঞ উদ্ভিদ নেই শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য মরে

ঝিঁঝি পোকার গোলকে উন্মোচন করো
পদ্মের আল আর ধানের রসায়ন
আমি হাল ধরে আছি, মৃণাল-শরীরে
এসো পিতা এসো সৃষ্টির শেষ নিঃশ্বাসে।
চাঁদের দিকে উঠে যাচ্ছে মুথা ঘাসের
চঞ্চল জোঁক। সপ্রাণ ধ্বনি জেগে ওঠে
অনির্বাণ শিকড়ে শিকড়ে প্রকাশনে।
হলুদ রোদের পাশে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য মরে

হলুদ পাড়ের পাশে শ্রেষ্ঠ দিন মরে

আমাদের তিতুমীর তোমার সকাশে
যায় ; কৃষ্ণপক্ষে খসে পড়ে সঞ্চয়ের
বাতাস ; আমাদের রিজিয়া উরুমূলে
রাখবে তোমায় ; আর হাসতে হাসতে
আমি দেখবো পতনের পাশের ঘরে
সৃষ্টি হচ্ছে নব্য নদী নব্য চরাচর।

চিকন ঝিনুক জানে কোথ পরলোক ;

ধর্ষণ থেকে কৃমি কীট পতঙ্গ আসে
নারীদেহে চার কোটি রোম গজিয়েছে
রাক্ষসের ঠোঁটে পোড়ে মাতাকন্যাবধূ
পুরীষ কবচ খুলে এসে দাঁড়িয়েছি
শয্যা থেকে উঠে আসো বাবা, মিথ্যাচারে
আমার কাছে মিষ্টান্ন পাবে না। নিজেকে
তাড়ণমন্ত্রের মালায় রেখো না। যুদ্ধ
খুলে দেয় কুমারীদের প্রাচীন জটা,
মগজে তৈরী হয় লোহার মাকড়শা ;
শালিকের ডিমে রোদ দিয়ে সূর্যদেব
নির্বাসনের কলঙ্কে তুচ্ছ হোয়ে যায়।
বিনাশের দাহ বড়ো মারাত্মক লাগে
মানুষের সন্ততিরা মন্দ তীরে থাকে

মানুষের সন্ততিরা ওড়ে চেতনায়

আজ তবে নেস্টর প্রোটিনের নির্জনে
যাই। মৃত পাখিটির করমচা মেখে
বুনোমোষের পেটের ভিতর ঢুকেছি।
শূককীট হতে পারি, দ্বীপের পাঁপড়ি।
ফুলকির ধনুর্বাণে হতে পারি দাঁত।
মাগীর চুম্বন থেকে মুখের লাবণ্য
বাঁচিয়ে সমুদ্রের লোহিতে মিশে যাই

আকর্ষণ শেষ হোলো। আজ তবে আসি।

ক্ষুরফলা কেঁপে গেলো। আজ তবে আসি।

প্রিতম মুখোপাধ্যায়

কেউ কেউ নয়, সকলেই কবি

সামনে ফায়ারিং স্কোয়াডের উদ্যত রাইফেল। দেয়ালে ঠেস একটা মেয়ে। চলছে কাউন্ট ডাউন-টেন-নাইন-এইট···। আর অবধারিত মৃত্যুর মুখে থুতু ছিটিয়ে মেয়েটা আবৃত্তি করে চলেছে মায়াকভস্কির কবিতা।—গদারের 'দ্য সোলজার' ছবির এক দৃশ্য।···তারপরই গুলির শব্দ। ধোঁয়া। চিৎকার। শুকনো বালির ওপর রক্তের নদী। লাল রক্ত। কবিতার মতই উষ্ণ, মানবিক আর দগদগে। এই গর্বিত অহংকারী সভ্যতা আর তার প্রভুদের সামনে কবিতা একটা পদাঘাত। কিন্তু শুধু পদাঘাতেই শেষ নয়, তারই পাশে মানবিক ভালবাসার অমোঘ বিচ্ছুরণ।

ফিউচারিস্ট আন্দোলনের প্রবক্তা মায়াকভস্কি অবশেষে বলে উঠলেন, 'ওরা যদি আমাকে হুকুম দেয় : / যুদ্ধে মরো / তাহলে তোমার নাম / শেষপর্যন্ত / গোলায়, ছিন্নভিন্ন ঠোঁটে জমাট বেঁধে থাকবে।'

রোবট, কম্পিউটারের যুগে এ সব কী অসম্ভব কথা শোনাচ্ছে এরা। তবে কি হৃদয়ের গোপন ঝরনাপথটি এখনও পাথরে চাপা পড়ে নি? সোনালী ডানার চিলের মতো আবার কি হৃদয় খুঁড়ে জেগে উঠবে বেদনারাশি?

'আপনারা কোন্ কবিতা শুনতে চান—বেদনা না বিপ্লব?' সান্টিয়াগোর এক শসাক্ষেত। একটা পাথরের ওপর উঠে নেরুদা প্রশ্ন করলেন তার শ্রোতাদের। ওরা সমস্বরে হৈ হৈ করে উঠল। কারো কথা আলাদা করে বোঝা গেল না। নেরুদা হাসলেন। তারপর স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন একটা প্রেমের কবিতা যার মধ্যে বেদনা ও বিপ্লব সুন্দর আর যৌবনের মতো মিশে আছে।

কবিতা তৈরী করে ক্রোধ, দেয় ভালবাসার প্রলেপ। যদি একটা জেটপ্লেন উড়ে যায় তবে তার ঘরঘরে গর্জনরেশ থেকে ফেটে যাক একটা পাথর আর জন্ম নিক একটা লালগোলাপ। যদি প্রবল জলস্রোতে ভেসে যায় পুরোনো শহর, বিক্ষত হর্ম্যরাজি, তবে সেই সঞ্চিত পলি মৃত্তিকা থেকে গড়ে উঠুক আর এক নতুন সভ্যতা। কবিতা নদীর মতো। কবিতা মানে একটা দ্রুতগামী বোমারু বিমান, একটা ঘোড়সওয়ার কিংবা পাহাড়ী ফাটল বেয়ে তিরতিরে এক ফল্গুধারা।

এই সমস্ত ইতিহাসের বোঝা কাঁধে নিয়ে হেঁটে চলেছে আধুনিক কবি। হাতে সাম্প্রতিকতম কবিতা। 'হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি'। প্রাচীন গুহার দেয়ালে দেয়ালে যে রেখাচিত্র সেইসব ভাষাহীন কবিতা দিয়ে তার যাত্রা শুরু। রেখা যখন অক্ষরে পরিণত হল, সভ্যতার সেই আঁতুড়সকালে, অবাক মানুষ তার অবাক করা পৃথিবীকে শুনিয়েছিল হৃদয়ের ভাষা। শুনিয়েছিল গানে, কবিতায়। তারপর আরো কতকাল আমাদের প্রপিতামহীরা তাদের উত্তরাধিকারীদের উপহার দিয়েছে

ফুল, পাখী আর কবিতা। কাঁথায় সূঁচ সুতোর কারুকাজ—'সোনার হরিণ তুমি কোন বনেতে থাক !' তারপর বিংশ শতাব্দী, মার্কসবাদ, বিশ্বযুদ্ধ, আণবিক বোমা, মহাকাশজয়—এইসব পরাম্পরা পেরিয়ে কবিতার অনির্দেশ যাত্রা। শুধু অতীতের পিছুটান ছাড়া কিছুই নির্দিষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা যাকে আধুনিক পৃথিবী বলে চিহ্নিত করেছেন, যার জন্ম মাত্র দু-লক্ষ বছর আগে, আজকের আধুনিক কবিতা বয়েসে সেই পৃথিবীর থেকে সামান্য ছোট—এই মাত্র।

মানুষের ঘাম, রক্ত আর হাসির বিনিময়ে গড়ে ওঠে শিল্পের মূল্য। ফরাসি থেকে রুশ সমস্ত বিপ্লবের আগে পরে ঝলসে উঠেছে ছবি, গান, কবিতা, গদ্য, সিনেমা। সোভিয়েত অভ্যুদয় আর আইজেনষ্টাইন, গোর্কি, চাইকোভস্কি ও মায়াকভস্কির সমসাময়িক অবস্থান ও বিকাশ নেহাৎ কাকতালীয় নয়, একটা অনিবার্য ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ সেভাবেই এসে ঠেকেছে ঢেঁকুর, হাই এবং হাহাকারে। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো ব্যতিক্রম ছিল। এবং ছিল যখন তখন আজো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শুধু সেই আশাতেই কবিতার ক্রিমিকীট নয়, ক্রিমিকীটের মধ্য থেকে কবিতা বাছার চেষ্টা।

'সব বিদ্রোহের চিরন্তন এবং স্ববিরোধী উদ্দেশ্য থাকে, এই ঈশ্বরকে হত্যা করে আর একটা গীর্জা বানানো'—আলবেয়ার কাম্যু।

অতএব নিহত ঈশ্বরের আত্মার উদ্দেশে কবি লিখলেন, 'যেখানে সমস্ত শেষ, সেখান থেকেই আজ / শুরু করা যাক—' (শেষের পরেও। অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়)। অর্থাৎ শেষের পরেও আবার একটা শুরু। অর্থাৎ আবার আর একটা গীর্জা। বস্তুত শেষ ও শুরুর মাঝখানে, ঈশ্বর নিধন ও অনুরূপ আর একটি গীর্জা নির্মাণের মাঝখানে দোদুল্যমান আমাদের সাম্প্রতিক কবিতা। রবীন্দ্রোত্তর যে কবিতাপ্রবাহকে আমরা অজ্ঞাতকুলশীল বলে ঠাউরেছি তা বস্তুত পরিণত হয়েছে এক কারুকার্যময় প্রমোদউদ্যানে। ক্ষমতা-অক্ষমতার প্রশ্ন নয়, আসলে এমন ছাড়া আর কিছুই হবার ছিল না।

তবু গা-ঝাড়া দিতেই হয় আধুনিকতার সম্মানার্থে আর তাই,

মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে লাভার বুদ্বুদ।

শুরু হয়েছে ইলেকট্রন সভ্যতা। ফিনফিনে পলিয়েস্টারকে লাথি মেরে জেগে উঠেছে রুক্ষ জীনস, স্টোনওয়াশ। অর্থাৎ কবিতা আর কবিতায় নেই। কবিতা পাঠ মানে একটা উড়ন্ত বিমানের চকিত চলে যাওয়া। 'পিত্তি পিত্তি পিত্তি পড়ে লাল কালো লাল ঘুরছে চিৎকৃত বেতাল পায়ে পায়ে / তার দাসী আসে যার পিঠের উপরে উচ্চ মাংসময় চূড়া ভ'রে পুঁজ' (খাসী। জয় গোস্বামী)। শব্দ আর গতির অদ্ভুত সমন্বয়। সমস্ত নিয়মকে, প্রচলনকে নীচে ফেলে জেট্-কবিতার ভ্রমণ এমন এক অন্তরীক্ষে যা আমাদের অগম্য, দুর্ভেদ্য এবং কখনো বা অলৌকিক। এই জারজ সভ্যতার যাবতীয় অহংকারকে চুরমার করে এগিয়ে চলেছে বুলডোজার কবিতা। মানবিক যা কিছু তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে গ্রাভস্-পরা বক্সিং কবি।

'বমনে বমনে হল উতরোল গঙ্গা / কুঠে উরস ভরা, রসে ভরা জঙ্ঘা / তবুও কাপড় তুলি ঘায়ে রাখি অঙ্গুলি / বসিয়ে খাওয়াই যত কীট ও পতঙ্গে' (অমরগীতি। জয় গোস্বামী)।

এই পৃথিবীর আদুরে মানুষগুলোর জন্য বেজে উঠলো কবিতার বিপদসঙ্কেত। কবির কোমরে র‍্যাক-বেল্ট, ছত্রে ছত্রে কুংফু-ছন্দ। পাঠককে বলছে, আর সংযোগ নয়—এসো সংঘাত করি—বিদীর্ণ হোক অবচেতন, কেঁপে উঠুক মস্তিষ্ক।

কিন্তু কাম্যুর উক্তি অনুসারে এই সব বিদ্রোহের পাশে পাশে পড়ে থাকে সেই 'চিরন্তন ও স্ববিরোধী' উদ্দেশ্য। কবিতার আর এক ভিন্ন মানচিত্র। যেখানে মন্ত্রের মতো তার উচ্চারণ।

যেন সংস্কৃত শ্লোকের প্রতি উজাড়করা উত্তরাধিকারী কৃতজ্ঞতা

'মনে পড়ে, আমাদের ঝকঝকে বায়ুশীতল আকাশ, / যা ক্রমশঃ অঙ্গারখানির গর্ভের মতো এখন অধোমুখ।' (আবার সাত জন্ম। মণীন্দ্র গুপ্ত)। কবিতার জন্মসাল এই পঁচাশি। হ্যাঁ, উনিশশো পঁচাশি। কমলকুমার লিখেছিলেন, 'তীর সমুখগতির নিনিত্ত পিছু হটে।' হয়তো সেই কারণেই এই সব কবিতায় কালীদাসীয় পিছুটান। 'ঘনশ্যাম, কূট-মনোহর বাদ্য ওগো, জেনো, / জীমূতবাহনরূপে আমি ক্রমশঃ আলোড়ন, রোহিনী-উদ্ভাসে' (উদ্ভাস। সমীরণ রায়)। পুরাতন রক্তের মোহ আবরণের মধ্যে যেন খুঁজে পাওয়া যাবে আজকের উদ্দাম পৃথিবী আর তার যাবতীয় সংকটের একমাত্র উত্তর। 'জন্মকাল থেকে তার স্মৃতিহীন বিলোল প্রদাহ / যবনী আড়ালে ছিলো, মাথা তার নোয়ানো ছিল না / এবার ক্ষুব্ধের দেশে চিল ওড়ে গগনসমীপে / ক্ষুধার্ত কে এলো নিতে একমুঠো আলো ভিক্ষাচাল' (শ্রবণ। সুতপা সেনগুপ্ত)।

অর্থাৎ শুধু কম্পিউটার, রোবট নয়, আধুনিক কবিতার ঘাড়ে চেপে বসেছে প্রস্তর-যুগের প্রাচীন গুহাচিত্র। মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা ! কাজেই আমরা ভুল করব, যদি সাম্প্রতিক কবিতার এই আধুনিকতাকে শুধুই কঙ্কীট জঙ্গলে ঠাসা আগামীদিনের হাহাকার বলে চিহ্নিত করি—কারণ এরই সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ অতীত, প্রাচীন যৌনতা এবং ঈশ্বরের চুম্বন ও আলিঙ্গন।

এবং অবিশ্বাস্য হলেও, সবচেয়ে কম আছে এই উনিশশো পঁচাশি। এই শহর, গ্রাম আর রাজ ও অর্থনীতি। আর এইটাই হল সাম্প্রতিকতম কবিতার প্রধান এবং পর্ব-প্রমাণ বিচ্যুতি।

কবিতা কোনকালেই জলবৎ তরলং ছিল না, কিন্তু সর্বসময়েই ছিল সমকালীন। মহাভারতের লেখক সর্বজ্ঞানী দেবতাকেও অর্থভেদের কারণে কলম থামাতে হয়েছিল। আমাদের সাম্প্রতিকতম কবিতা কিন্তু দুর্বোধ্যতা ও অকালপক্কতার মাপে সম্ভবত মহাভারতকেও অতিক্রম করে গেছে। আজকের জীবন যে জটিলতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু জগৎ, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সেই শুভা-শুভের গোপন ঝরনা আজো বহমান। হৃদয় আজো বিকিরণশীল। সমূহ অসভ্যতার

মধ্য থেকে সেই ঝরনামুখে,রুপালী জলপ্রবাহের কাছে মানুষকে আনত করার দায়িত্ব শিল্পীর হাতে ন্যস্ত। তাই এলিয়টের মুখে শোনা গেল, 'মহৎ কবিতা আক্ষরিকভাবে বুঝে ওঠার আগেই আমাদের উপলব্ধিকে প্লাবিত করে তোলে।' শাগালের সুর্‌রিয়ালিজম কি গদারের নবতরঙ্গ শুধু চিৎকৃত আধুনিকতা নয়, নয় কোন ইস্‌থেটিক এনার্কিজম সম্ভূত, বরং হৃদয় এবং উপলব্ধির মধ্যে এত গভীরভাবে গেঁথে যায়, যে বিংশশতাব্দীর মানুষ ও সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। পাসোলিনীর কথায়, 'সো টু মেক ফিল্মস্ ইজ টু বি এ পোয়েট।' কবিতা ছাড়া মানুষকে আলোড়িত করার অন্য কোন শক্তিশালী মাধ্যম তাঁর জানা ছিল না। আরগঁ, এলুয়ার, লোরকা, মায়কভস্কি কেউই শব্দ আর আধুনিকতার সেবাদাস ছিলেন না। মানুষ আর তার উপলব্ধি দিয়েই গড়ে উঠছে কবিতার একান্নবর্তী পরিবার। তাই হাইনে একই সঙ্গে বিপ্লব ও প্রেমের কবি। রাগী ছেলে ইয়েভ্‌তুশেঙ্কো সরকারীমতে দুষ্টু ঘোড়া হলেও সাধারণ মানুষের কাছের লোক।

অর্থাৎ কবিতা শুধুমাত্র তার অর্থে নয়, উপলব্ধিতেও প্রকাশিত হয়ে উঠবে। গল্প বা উপন্যাসের সঙ্গে, মোটাঅর্থে, এই তার পার্থক্য এবং ছবি ও গানের সঙ্গে এই ভাবেই তার আত্মীয়তা।

অথচ সেই আত্মীয়তা ছিন্ন করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই কবিতা ক্রমশ বিষয়মুখী হয়ে উঠল। একদল বলতে শুরু করল, কবিতা আর গদ্যের কাঁটাতার ভেঙ্গে ফেলো। অথচ এই একই সময়ে নাটক থেকে গল্পের ছাল ছাড়িয়ে নিতে শুরু করেছেন ব্রেখ্‌ট্‌। গদারের হাতে ভেঙ্গে যাচ্ছে ন্যারেটিভ স্টাইল। দালির তুলিতে চূড়ান্ত সুর্‌রিয়ালিজম।

আমেরিকার পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়ে পাউণ্ড বললেন, 'আমি যখন যুবক ছিলুম, তখন কবিতা ভাবাবেগে মরে যাচ্ছিল। আমি তাকে বিষয়ের দিকে টানলুম। এখন সেই কবিতা বিষয়ের ভারে মরণাপন্ন।' উক্তিটিতে দম্ভ যতটুকু, সত্য তার তুলনায় অনেক বেশি।

আজ, কবিতার প্রতিটি ছত্রে বিষয়ের হাতছানি। ওহে, পাঠকের দল তোমরা এসে দেখে যাও—আমি কী রকম বেঁচে আছি। আমার যৌনতা, ঈশ্বর আর নৈরাজ্যবাদ ঘিরে যে অসংখ্য বিষয়—দেখে যাও তার প্রদর্শনী। অর্থাৎ ফুলের গাছ নয়, দেখে যাও বাগানের চারপাশে বেড়ার সৌন্দর্য।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

'ট্যাংরা পঁয়ত্রিশ টাকা কিলো—/বিপ্লব ছাড়া পথ নেই—/বলল গোপাল' (ত্রয়ী। পরেশ মণ্ডল)। 'টাটা সেণ্টারের ছাদে শহরের চোখে ধুলো দিয়ে চাঁদ উঠেছে/আত্মহত্যার জন্যে,' (চাঁদের কাছে। সন্তোষ চক্রবর্তী)। 'মনে হয় রক্তাক্ত পথেই একা হেঁটে চলেছেন শান্ত ঋষি/শোভা, তোমার ঘরে এসে তোমার শিশুর সাথে হাসি' (ঘাস। অরুণেশ ঘোষ)।

কবিতার অংশগুলোতে পরপর উঠে এসেছে বিভিন্নরকম বিষয়। বিষয় থেকে

উপলব্ধিতে পৌঁছতে চায় লেখক। রঁদার এক টরসো দেখে জনৈক দর্শকের বিরক্ত প্রশ্ন, 'বাট হোয়ার ইজ দ্যা হেড?' রঁদার উত্তর, 'দ্যা হেড ? ইট ইজ এভরিহোয়ার।' একইভাবে সমস্ত কবিতাময় জেগে উঠবে উপলব্ধির অদৃশ্য জগৎ। কিন্তু উপরোল্লিখিত পরপর কয়েকটি চিত্রকল্প এবং শেষমেশ লজিকাল কনক্লুসানের মতো একটি বিবৃতি—আর যাই হোক না কেন কবিতা নয়। কবিতা আর হিতোপদেশের গল্পে অনেক তফাৎ।

কিন্তু বিষয় বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা যখন অসম্ভব তখন তার কবিতাই বা বিষয়হীন হতে পারে কিভাবে ? ব্যক্তিগত কবিতায় তবু বিষয়কে বাদ দেওয়া যাবে কিন্তু কবিতা যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেখানে বিষয়ের অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। হাংরি আন্দোলনের কবিরা এইভাবে বিষয়হীন হতে গিয়ে ব্যক্তিগত কবিতার বদ্ধ জলাশয়ে বন্দী হয়েছিলেন একদিন। স্বভাবতই, হাংরি কবিতায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, লেখকের উপলব্ধিকে পাঠক স্পর্শ করতে পারল না। আন্দোলনের বাইরের কবিরা তাই আরো গভীরভাবে বিষয়ী হয়ে উঠলেন। ষাট ও সত্তরের কবিরা আরো এক পা এগিয়ে শুরু করলেন 'আমি'-র বদলে 'তুমি'। অর্থাৎ কবি এখন আর খেলোয়াড় নয়—খেলার দর্শক।

নিঃসন্দেহে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে কবিতাকে মুক্ত করার জন্য এক সময় এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল কয়েকটি বিপজ্জনক ভাইরাস—চিত্রকল্পের মন্তাজ, সাংবাদিকতা আর গল্পোকালচার। তলিয়ে গেল উপলব্ধির জগৎ। কবিতা, ক্রংক্রীট সভ্যতার উপযুক্ত হল ঠিকই কিন্তু তারই সঙ্গে চাপা-পড়া ঘাসের বেদনা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারল না।

এবার কবি প্রশ্ন করল নিজেকে। কোথায় তোমার ব্যক্তিগত ক্রোধ, হতাশা, বেদনা ? উত্তরে কবি লিখল—

'ওই স্বপ্নময় অবয়ব/আবছা কুয়াশা প্রসাধনে/কী ভীষণ অলৌকিক !' (স্কেচ। দেবাশিস বসু)। 'বরং/শরীর জুড়ে আমার পুড়ুক/কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য।' (সংক্রান্তি। দেবব্রত ঘোষ)। 'আমাদের অপমানভরা দিনগুলোর কথা/আজ আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের রোগা, ভিতু/দিনগুলোর কথা' (আমপাতার মুকুট-১৫। অভিরূপ সরকার।)

আমরা ভুলে গেছি, পেরিয়ে এসেছি কিংবা হারিয়ে ফেলেছি এইসব অনতিক্রম্য হাহাকারে ছেয়ে গেছে সাম্প্রতিকতম আধুনিক কবিতা। যেন বর্তমানে কি ঘটে চলেছে তা জানাবোঝার কোন দরকার নেই—যেন বুকের মধ্যে অবিরল বেজে চলেছে অতীতের ঘণ্টাধ্বনি। চলছে জাবর কাটা। উটের মতো বালিতে মুখ গোঁজার চেষ্টা।

'বিচার/পৌলমীপুত্র, সংহনন—/শোনো, গোধূম-ছায়িত শবে/দেবশোক/পৃষতকামনা' (একষষ্ঠিকা। শুভাশিস মণ্ডল)। 'আমি সেই অগ্নিকুণ্ডে তাকাতে পারি না/বসে আছি পূর্বাস্যে একাকী,/সম্মুখে উদয়-ভানু, আকাশ এখন দেবালয়।'

(অনন্ত প্রবাসে যাচ্ছ। রবীন আদক)। 'গহ্বর খুঁড়ে আনি দিনের আলোয়/ দেখা যায় পীত আভা মননের হৃদে/জ্বলন্ত পাখীর গান সে শুনেছে, বিনিময়ে/ দিয়েছে অযুত মতিহার/ভবিষ্যৎ মানে না কখনো' (খনন। সুতপা সেনগুপ্ত)··· ইত্যাদি।

কিছুদিন আগেও দাসনগরে কৃষ্ণনগরের পুতুল দিয়ে জন্মাষ্টমীর মেলা বসত। কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত। ইলেকট্রিক চালিত কৃষ্ণঠাকুর ঝাঁপিয়ে পড়ত কংসের বুকে। আমাদের বেশ মজা হত। প্রচুর ফুচকা খেয়ে মাটির ট্রেন চেপে ফিরে আসা হত একসময়। আধুনিক কবিতার অতীত নিয়ে আদিখ্যেতা এখন সেই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

বিষয়ী লোকেরা চিকালই মাটিতে পোঁতা একটা ঘড়া আর তার মধ্যে অনেকগুলো মোহরের স্বপ্ন দেখে। মানে, দেখতে ভালোবাসে। এমন এক স্বর্ণময়ী অতীতের মোহ ব্যতিরেকে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কাজেই, পঞ্চাশের ক্রোধ ও স্মার্টনেশ পেরিয়ে, হাংরি কবিতার 'আমিত্ব' এড়িয়ে, আধুনিক কবিতার সামনে একটাই মাত্র কুসুমাস্তীর্ণ পথ খোলা ছিল। এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে কবিতা সে পথেই পা বাড়িয়েছে।

কোন কিছুই স্পষ্ট করে বলার দরকার নেই

এই পৃথিবীতে কোনটা স্পষ্ট ? পৃথিবীটা কেন ঘুরছে ? একটা বাচ্চা জন্মেই কেঁদে উঠছে কেন ? কেনই বা বোমা পড়ল হিরোসিমায় ? আর আমিই বা পাতার পর পাতা পদ্য লিখে যাচ্ছি কিসের জন্য ?

ঠিকই তো, এত সব অস্পষ্টতার মধ্য থেকে কবিতাই বা আলাদা করে স্পষ্টবাদী হতে যাবে কোন দুঃখে! বা, আর একটু অন্যভাবে বলা যায়—কবিতা শুধুমাত্র তার স্রষ্টার কাছেই দায়বদ্ধ। কিম্বা বিজ্ঞের মাথা নেড়ে এরকম জবাবও হতে পারে, পাখীর গানের কি কোন মানে আছে, সেও তো অস্পষ্ট।

তোওয়া, তোওয়া ! কিন্তু স্যার, মানে না থাকলেও সুর তো আছে। পৃথিবীর আহ্নিকগতিতে অন্ততঃ একটা ছন্দ তো আছে। একটা সামান্য এটমের মধ্যেও আবিষ্কৃত হয়েছে নিখুঁত শৃঙ্খলা। এই যে সুর, ছন্দ আর শৃঙ্খলা—এর মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে পরিচ্ছন্নতা। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ শিখেছিল পরিচ্ছন্নতা—আরো গভীরভাবে তাকে জানতে গিয়ে পেয়েছিল সুর, ছন্দ আর শৃঙ্খলা। তারপর মানুষ নিজেই একদিন প্রকৃতির অনুকরণে গড়ে নিতে শুরু করল। জন্ম নিল শিল্প। প্রকৃতির মতই এই শিল্পও কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আর নয় বলেই তাকে হতে হয় পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্টবাদী।

কথায় বলে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। 'আমিত্ব-ত্যাগী ভাগের কবিতা হারিয়ে ফেলল পরিচ্ছন্নতা। ঘনিয়ে এল কুয়াশা। পাতার পর পাতা জুড়ে খালি অক্ষর-সমূহ, শব্দ, ছেঁড়াখোঁড়া ছবি, গল্প আর স্মার্টনেশ। সকলেই কবি। প্রতিটি হাতেই চকচকে সোনার কলম। যেন ঝলসে উঠছে মেসিন-ছাঁটা সমতল ঘাসের সৌন্দর্য।

'অনেকদিন / একটা হেমন্তকাল খুঁজছি / কখনও একা একা, কখনও লণ্ঠন নিয়ে / একটা হেমন্তকাল / একটা লাবণ্য' (মিলন। নির্মল হালদার)। 'সমস্ত শরীর জুড়ে আলস্য নেমেছে / পিঠে, পায়ে, জরায়ুতে, পায়ের পাতায়।' (তারামণ্ডল। মল্লিকা সেনগুপ্ত)। 'এই অজ্ঞাত বনে আমি কায়কল্প পোকাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি / মৌমাছিরা যেমন চাকে বসে তেমনি ভুলিয়ে এনে যদি তাদের / এই শরীরে বসাতে পারি।' (কায়কল্প পোকা। মণীন্দ্র গুপ্ত)

উদ্ধৃত অংশগুলিতে কোন অস্পষ্টতা আছে কি ? না, নেই। প্রতিটি শব্দের ব্যবহার যথাযথ। তবু সামগ্রিকভাবে কোন পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে না। সাম্প্রতিক কবিতায় এই দুর্বলতা এত ব্যাপক যে মনে হতে পারে, যেন 'ইহাই আধুনিকতা'। অতএব যাহাকে তুমি শূন্য পাত্র বল তাহা বস্তুত জলপূর্ণ কলস। অতএব হে অর্বাচীন পাঠক, জরদগব সরলতার খোঁজে তুমি বরং ফিরে যাও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে।

যথা আজ্ঞা। তবে রবীন্দ্রনাথই সই। বলেছিলেন, হে অন্ধ অতীত, কথা কও। অতীতের সঙ্গে কোন অহেতুক ঢলাঢলি ছিল না তাঁর। তাঁর রচনায় কথা বলেছিল মহাভারতের চরিত্ররা। বলেছিল বর্তমানের সুরে। এ সব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। আজকে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি, যে রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও ডিরেক্ট স্টেটমেন্টের এতটুক ঘাটতি নেই। নজরুলের কবিতায় সরাসরি আক্রমণ আর একটু বেশী। জীবনানন্দের তুলনায় কম। এবং এরপর, আজকের কবিতায় কেবলই রাশি কর্মোদ্যোগ। যা ঘটছে, তা আপনাদের চোখের সামনে ছবির মতো সাজিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কেন ঘটছে ?

হ্যাঁ, কেন ঘটছে ? ইয়েস স্যার, ধারাভাষ্যকারের কাজের মধ্যে এটাও পড়ছে। কিন্তু এইখানেই বিপত্তি। কারণ এই কেন-টেনর মধ্যে যেতে গেলেই চিক-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়বে কবির নিজস্ব বিশ্বাস আর মানসিকতা। যদি তাই হয়—যদি ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে বেড়াল তাহলেই বা ক্ষতি কি ? ক্ষতি এইটাই যে তৎক্ষণাৎ কবি আর তার নিজের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। কবি তো এখন আর খেলোয়াড় নয়—দর্শক। কাজেই সুবিধেমত সে পারে যে কোন দিকে বেঁকে যেতে। যে ভাল খেলবে আমি ভাই তার দলে। অতএব আমি ধর্মেও আছি, জিরাফেও আছি। জলে নেমে চুল শুকনো রাখার জন্য তাই আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তেমন ঢেউ নেই তাই, নতুবা এ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার রণক্লান্ত কবিতে ভরে যেত বাংলা সাহিত্য।

আছে শিখণ্ডি—আছে আদিম সাম্যবাদ, ঈশ্বর ও যৌনতা

এই সার সার অসার অস্পষ্টতার মাঝে কবি হাঁফিয়ে ওঠেন। কমিটমেন্টের কামড় ছাড়া কবিতার যাবতীয় রস যেন তাড়ি হয়ে যায়। সুতরাং যে গরুর গা ধুইয়ে। কিন্তু কী সেই কমিটমেন্ট যা করে নাকো ফোঁসফাঁস, মারে নাকো ঢোঁশঢাঁশ ? এরকম কোন কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয় কি ? হাতের জোর থাকলে সবই হয়। সকলেই

নিখুঁত কবি—সকলের হাতেই স্মার্ট, চটপটে কবিতা। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে কবি নিয়ে আসে আদিম সাম্যবাদ, ঈশ্বর ও যৌনতা। নিয়ে আসে এমন এক মুক্তজীবন যার কোন শত্রু নেই। সুতরাং দাও ফিরে সে অরণ্য। অর্থাৎ কি না, সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আনতো—তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা, করে দিই ঠাণ্ডা। ঘনিয়ে আসে আধুনিক বাংলা কবিতার অকাল-বার্ধক্য—শুরু হয় বানপ্রস্থ যাত্রা।

'কুষ্ঠের শহরে গিয়ে ভালো থাকি যেন / প্রেতের শহরে এসে ভালো থাকি যেন' (স্বামীর প্রার্থনা। সুবোধ সরকার) লক্ষ্য করুন 'কুষ্ঠ' ও 'প্রেতের শহর' শব্দ দুটিকে। 'ব্রাহ্মণগণ তোমাকে বলেছে দামড়া / ভাবোনি তোমাকে কন্যা দেবার যোগ্য / এখন বলবে নারী অপহারী আর্য' (অশ্বমেধ। মল্লিকা সেনগুপ্ত)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 'ভয়ঙ্কর নষ্ট হওয়ার, কিংবা দাঁতাল শুয়োর হওয়ার / তেমন প্রতিভা / তার ছিল না, তাকে বললাম, যা / পোকায় তোরে নষ্ট করুক, তুই পোকাকে খা' (ধ্বংস প্রতিভা। সুধীর দত্ত)। যেন পালি ভাষায় তালপাতার ওপর লিখিত মধ্যযুগের রুদ্ধ কবিতার আধুনিক বঙ্গানুবাদ।

এ সবই সামান্য কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। ছোট, বড় যে কোন পত্রিকার পাতা ওল্টালে চোখে পড়বে এমন অসংখ্য উদাহরণ। পঙ্গপালের মতো বাংলা কবিতার সর্বাঙ্গে পিলপিল করছে অতীতের পোকা।

আধুনিক যৌনচেতনা এবং ঈশ্বর বিশ্বাসকে কুরে খাচ্ছে এই একই অতীতের পোকা। আজকের মানুষকে এই দুই চেতনা কখনই আর সীমাহীন আনন্দ বা ভয়ের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। একটা মূল্যবোধ থেকেই গড়ে উঠেছে মানুষের যৌনতা ও ঈশ্বর সম্পর্কিত আজকের ধারণা। আদিম সাম্যবাদী সমাজে এমন কোন মূল্যবোধ ছিল না। সেখানে সবই ছিল নিঃসীম। সাম্প্রতিক কবিতার আকাশে-বাতাসে সেই নিঃসীমের আকুতি। ঈশ্বর মানে সেখানে শুধুই ভয় আর ভক্তি, যৌনতা অর্থে অবিমিশ্র আনন্দ—এই দুই চেতনার মাঝখানে যে অজস্র টানাপোড়েন, সভ্যতার ঘাম ও রক্ত তার প্রতি এঁরা অদ্ভুতরকম উদাসীন। অনেক পরিশ্রম করে খুঁজে পেতে হবে সেই মধ্যযুগের ঈশ্বরকে যার খাঁজে খাঁজে জমে আছে শঠতা, ভণ্ডকতা আর অর্থলিপ্সা। বা যদি পেতে চাই সেই যৌনচেতনাকে যেখানে নারীমাত্রেই ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত, তো উল্টে যেতে হবে পুরো পাতিরাম বুকস্টল। আমরা শুনেছিলাম ধর্ম একধরনের আফিং। আবার গান্ধীজীর মুখে শুনলাম, 'জ্যামিতিতে এমন কিছু ধারনা আছে, যেমন বিন্দু—যাকে ছোঁওয়া যায় না কিন্তু যা কাজে লাগে, ঈশ্বরও সেই রকমই।' আধুনিক কবিতার ঈশ্বর কিন্তু কাজেও লাগে না আবার নেশার জিনিষও নয়। বস্তুবাদের নামগন্ধ নাহি তায়—তার চারপাশে শুধুই ভাববাদী ধুনোর ধোঁয়ার ধোঁয়া। যেন এই ধোঁয়ার মধ্যেই বেজে উঠছে শিঙা, ডম্বরু। নাচছে উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। একপাশে আগুন জ্বলছে। ঝলসে উঠছে কাঁচামাংস। আদিম মানুষেরা হৈ হৈ করে মাংস খাচ্ছে, ঝটিতি চুম্বন ও যৌনবিনিময় এবং তারপরই লুটিয়ে পড়ছে ঈশ্বরের পদতলে। দৃশ্যটা কল্পনা করুন এবং তারই পাশে পাশে শব্দগুলো সাজিয়ে নিন।

অজ্ঞাতবাস

'সর্পপঞ্চমীর রাতে কুহকী বিস্তারে/চোখের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল রতিমন্দির' (উজাগর। দেবব্রত ঘোষ)। 'ঐ সূত্রধর, ঋষি/হর্ষতনয়ের গান!' (স্তুতিপাঠ। অশোক দত্ত) 'চুম্বনে ধরাশায়ী হলো সে, নেমে এল কুঠার/অস্ফুট জানালো শুধু সে, আমি তবে কার?' (একটি কবিতা। ধূর্জটি চন্দ) 'হে, উনিশশো চুরাশি/হে, স্বপ্নহীন আধিভৌতিকতা/হে পুরাতন প্রকাশভঙ্গিমা' (জন্মদিন। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'চল চলে যাই এই নদীতীর বৃক্ষের তল ছেড়ে/এখানে বিষাদ, বিষাদের তীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুন মরে।' (দ্বিপদী। নারায়ণ ঘোষ)। 'নাভি কুণ্ডলিনী থেকে উঠে এলো/ঋষিরা বললেন ঈশ্বরের ঘুম ভেঙ্গে গেলে/রহস্যের দরজা খুলে যায়,' (শেষ ছাই। উত্তম দাশ)।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কবিতা যতই বিষয়মুখী হয়ে উঠবে ততই তাকে জোগাড় করতে হবে চমকে দেবার মতো শব্দ, চিত্রকল্প এবং বিন্যাস। মানুষ কিসে চমকায়? নতুন জিনিষে। সদর ঘরের একপাশে থাকবে স্পেশ-এজ সোফা আর একপাশে কালীঘাটের পট। অতিথি বলবে, বাঃ। সদর ঘরের মালিক সাফল্যের হাসি তুলে বলবে, 'ওঃ অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এ সব ডিস্‌কভার করলাম মশাই।' বারোয়ারি পূজা কমিটি এভাবেই ডিস্‌কভার করে ব্লেডের ঠাকুর বা টেরাকোটা দেবীমূর্তি। বিষয় কবিকে পরিণত করেছে ডিস্‌কভারারে। তাই বর্তমানকে বাদ দিয়ে কবি হয়ে পড়ল দুকালজ্ঞ। স্রেফ পুরানো সেই দিনের কথা আর আগামী শতাব্দীর চমকানি। অথচ সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল জীবন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই সব কবিরা কেউই তেমন পুরাতন কিংবা অত্যাধুনিক নন। আর নন বলেই পাশ্চাত্য আধুনিক কবিতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার খাতিরে এঁরা নিজেদের চারপাশে গড়ে তোলেন বানানো জীবনবোধ ও বিশ্বাসের অদ্ভুত এক মায়াজাল। অর্থাৎ কবির জীবন থেকে তার কবিতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন কিছুই সংযোগহীন হতে পারে না তাই এই বিচ্ছিন্নতার পুচ্ছ ধরে জন্ম নেয় মানসিক নৈরাজ্যবাদ।

সব ওলটপালট করে দে মা, লুটেপুটে খাই

'শুকিরে ঝন্‌ঝনে হও, দাহ্য হও, জলো! / দগ্ধ করো জনপদ, / বনস্থলী পুড়িয়ে করো ছাই—/ জমে যাক ভস্মের পাহাড়', (হে আলোক। শরৎসুনীল নন্দী)। 'পাপের শহর দেখাবো, নরকের দরজা খোল, নারী।' (নরকের দ্বারী, নারী। গীতা চট্টোপাধ্যায়)। 'ভেবেছি চেংগিজ খান যে লাগাম ছেড়েছে মৃত্যুর কিছু পরে / তার রশি টেনে ধরে লণ্ডভণ্ড করে দেব এইসব জালজুয়াচুরি' (পরাজয়। মলয় রায়চৌধুরী)। 'ভালবাসা অন্নজান, চোঁয়া ঢেঁকুরের সঙ্গে উঠে আসে থুতুর লবণে / হে মৃত্যুবণিক তুমি ইজারা নিয়েছো জন্ম কখন গোপনে / শুধু ফেলে গেছ নিঃসঙ্গ রাত্রি আর নিভে যাওয়া হুকের গোধূলি' (অন্ধকার কবিতা। পিনাকী ঘোষ)।

কবিতার উদ্ধৃত অংশগুলিতে ফেটে পড়েছে চরমপন্থা। যেন রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র এনার্কিস্ট। ট্রিগারে হাত। চোখে প্রতিহিংসা।

উনষাট

নাসারন্ধ্রে স্ফুরিত কামনার গরম শ্বাসপ্রবাহ। কান পাতুন—শুনতে পাবেন নারীর খিলখিলে প্রমত্ত হাসি, পুরুষের হুঙ্কার আর গুলির শব্দ। আরো কাছে যান—দেখতে পাবেন, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ, সমবেত বিজয়োৎসব আর সঙ্গমরত নরনারী।
ঠিক যেভাবে একটা বাজার চলতি হিন্দী সিনেমার দ্বারা আপনার রসনা পরিতৃপ্ত হয়, সেভাবেই সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যেও পেয়ে যাবেন যাবতীয় প্রমোদ উপকরণ। 'সোলে' কিংবা 'টারজান' থেকে যে নৈরাজ্যবাদ ও চরমপন্থার বিকৃত মুখ ভূতের মতো দর্শকদের ঘাড়ে চেপে বসে তার তুলনায় আমাদের আজকের কবিতা কিছুমাত্র কম ভূতগ্রস্ত নয়। ফাইটিং ডিরেক্টরের মতো আমাদের কবিরাও মাথা খাটিয়ে বার করেন নানারকম চিত্রকল্প, বাক্যবন্ধ। মাথা খাটাতেই হয়, মাথার ঘাম কপালে ফেলে বানিয়ে নিতেই হয় কারণ যেহেতু কবির জীবন এবং তার কবিতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিপরীতার্থক।

গল্প-উপন্যাস, নাটক বা চলচ্চিত্র কখনই তার চারপাশের বাস্তবতা থেকে বেশী দূরে সরে যেতে পারে না। যেহেতু কয়েকটি চরিত্র, ঘটনা এবং তাদের সম্পর্কের সূত্র ধরে গল্প, নাটক বা চলচ্চিত্র এগিয়ে চলে তাই সুতোয় টান পড়ার আগেই তাদের পিছিয়ে আসতে হয়। কিন্তু কবিতা এবং পেণ্টিং-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন পিছুটান নেই। সে কারণেই কবি ও চিত্রকরদের মধ্যে যে কোন বিপদজনক রোগ সহজেই সংক্রামিত হতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রপ্রবাহ যে ভাবে ছবি ও ভাস্কর্যের রাশ টেনে ধরতে পেরেছে, আধুনিক কবিতার মধ্যে প্রবাহের সেই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল না। পারলে, সাম্প্রতিকতম কবিতা হয়তো তার নিজের মাটি খুঁজে নিতে পারত।

গণেশ পাইন কি বিকাশ ভট্টাচার্যের ক্যানভাসগুলি আমাদের অপরিচিত নয় কারণ আমরা দেখেছি কি ভাবে প্লাসটিক ফর্ম সেই অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায়, নন্দলাল বসু পেরিয়ে আজকের আধুনিকতার সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছে। রামকিঙ্কর বেইজ তাঁর পরবর্তী ভাস্করদের হাতে তুলে দিলেন পাথরের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার। অথচ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই জন্ম নিল আধুনিকতা। জীবনানন্দ কি সুধীন্দ্রনাথ তো পরের কথা, তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথ বা মোহিতলালের মধ্য দিয়েই এই বিরোধীতার শুরু। অমিয় চক্রবর্তীর দুর্বল অস্তিত্ব ভেসে গিয়েছিল কল্লোলপ্রবাহে এবং তারপর 'কবিতা', 'কৃত্তিবাস' পেরিয়ে সাম্প্রতিক কবিতা এসে দাঁড়াল এক মরুভূমির মাঝখানে। অদূরে মরীচিকা। পঞ্চাশের কবিরা যে হুল্লোড় শুরু করেছিলেন, যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা—যার গন্তব্যে কোন ঠিক ছিল না তা যে শেষপর্যন্ত যথেচ্ছাচারে পরিণত হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। তাই ষাট ও সত্তরের কবিরা আর ভীড়ের মাঝখানে নাচনকোদন নয়, শুরু করলেন ব্যক্তিগত প্রদর্শনী। এইভাবে গড়ে উঠল সল্টলেকের মতো কবিতার মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ির শহর। রবীন্দ্রনাথ নেই, জীবনানন্দের ধূসর মর্মবিড়িটি বা রূপসী বাংলাকে ছোঁওয়া বড় শক্ত, বামপন্থা বড়ই ক্লিশে—অতএব বিদেশী কবিতার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকল না। যন্ত্রসভ্যতার ঠোক্কর খেয়ে পাশ্চাত্য কবিতায় তখন জেগে উঠেছে অতীতের বন্দনাসঙ্গীত, ঝরে পড়েছে ভবিষ্যতের প্রতি ঘৃণা। আমাদের কবিরা, মহানন্দে 'চমৎকার, ধরা যাক দু-একটি কবিতা এবার' বলে হজম করতে আরম্ভ করলেন ঐ সব কবিতা। অতএব অটোমেশনের আগেই এসে গেল অটোমেশন-বিরোধী কবিতা, গ্রামের কবি তার কবিতায় শোনালেন অরণ্য-রোদন।

কিন্তু আমরা কবিতার কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম আমাদের নিজেদের কথা। আমরা চেয়েছিলাম কবিরা তাঁদের মনের কথা বলুন। ভুল হোক, ঠিক হোক তবু তাঁরা প্রাণ খুলে সে কথা উচ্চারণ করুক। প্রতিফলিত হোক প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস। এভাবেই ধরা পড়বে, গড়ে উঠবে একটা অস্থির সময়ের চলচ্চিত্র। যা হোক একটা কিছু বলুন যাতে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে আপনাকে চেনা যায়, বোঝা যায়। বন্ধ করুন—এই পুতুল নাচ, মুখোশ নৃত্য। ধরা পড়ে যাবেন ? তাতে কি ? নিজেকে না ধরিয়ে দিতে পারলে কোন সৃষ্টিই সম্পূর্ণ নয়—তা সে কবিতা কিংবা সন্তান, যাই হোক না কেন।

অজ্ঞাতবাস প্রাপ্তমনস্কদের কবিতার কাগজ।

অজ্ঞাতবাস শুধুমাত্র প্রাপ্তমনস্কদের প্রতি নিবেদিত কাগজ।

শেখর মৈত্র

ঈশ্বর

ঈশ্বর নামের সেই ভদ্রলোকটির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়
দু'-বেলায়-ই

যিনি শেখান বেশ্যাকে নৈর্ব্যক্তিক রতিবিদ্যা

এবং বুকেতে যৌবন যখন ফুল হয়ে ওঠে
দেহোপজীবিনীর অপাপবিদ্ধা কিশোরী মেয়েটির
ঝর্ণাকে চোরাবালিতে বিবস্ত্রা টেনে নিয়ে যেতে
                    শশব্যস্ত লোলচর্ম তিনি
কুসুমিত স্বপ্নকে পা দিয়ে চট্‌কে
গর্ভপাতের উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে মন্দিরে সেঁটে যান জগন্নাথ হয়ে !

অনুরাগ তবু মোহময় সেই পাপে

নৈঃশব্দ্যের ফাঁস গহন কালো চুলে   শ্বাসরুদ্ধ শব্দরা সব এবং
পঞ্চেন্দ্রিয়   কুমারী শিল্প মূর্ত পাঁচটি আঙুলে   মৌন বৃষ্টিপাতে
তবু ঝরে নাম প্রিয়

আশ্লেষে খান্‌খান্ সাজানো আকুতি   অবিরাম মৃত ঠোঁটে কবোষ্ণ
সঙ্গীতে   আকাঙ্ক্ষার উদ্যানে তবু জ্বালিয়ে দ্যুতি   নিসর্গের খিন্ন
পাখি অমন নিসর্গাতীতে

ক্রুদ্ধ জোয়ার উল্লাসের আঙুরক্ষেতে   তছনছে শিথিল করে সযত্ন
মঞ্জরী   যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে তবু তৃপ্ত প্রীতে   মোহমুগ্ধ নখ বেঁধায়
লুব্ধ সেই পরী

অনুরাগ তবু মোহময় সেই পাপে   নরকের নিষিদ্ধ এক চুল্লীর
উত্তাপে

দূরবর্তিনীকে, পাঁচিলের এপার থেকে

একে একে সব কিছু মুছে যায়, যেতে পারে—
হাসি, রেণু রেণু স্বপ্ন, মরুভূমির বালির ওপরে জলের ফোঁটা···

অথচ সর্দি লাগার ভয়ে
তার তো অবেলায় নাইতে যাবার কথা ছিলো না
এবং দড়ি-কলসীও পরায় নি তার গলায় নিতান্ত কোনো বাধ্যবাধকতা !

গরাদখানায় অবরুদ্ধ অবদমিত অশ্লীলের সাপ
তবে কি দুধে-ভাতে পুষতে তার একান্তই ইচ্ছে, সিঁথিতে ?

অনির্বাণ

"তন্‌হায় বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি।"—সুত্তনি : ১১০৯, সংযুত্ত ১।৩৯।

'ঈশ্বর, তোমায় আমি সব দিলাম
এই নাও ছুঁড়ে দিলাম আগুন, আকাঙ্ক্ষার শব
                    ও সিগারেট না ধরানো'
—এই বলে দৌড়ে ছুটে গেলাম সমুদ্রের কাছে

সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে একজন নারী
যেন খুব চেনা, যেন স্বপ্নে দেখা সেই প্রিয় মুখ
প্রশ্ন করলাম, 'সমুদ্রেরও তৃষ্ণা থাকে নাকি'

নিরুত্তরে সে শুধু হাসলো, অথচ ঠোঁটে তার পৃথিবীর সমস্ত বেদনা

এক বুক তৃষ্ণা নিয়েও আমি সমুদ্রকে ছুঁতে পারলাম না

ভাস্কর চক্রবর্তী

মজা

চলো যাই আরো দেখে আসি—
মজা লাগছে খুব।

বিজলী বাতির শব্দে কেঁপে উঠছে ঘর।
নারীর
কর্কশ স্বরে
কেঁপে উঠছে ঘর।

চলো যাই দিনের ভেতরে, আর
রাতের ভেতরে

বসে থাকি ঢেউয়ের চূড়োয়।

দাম্পত্য

মেঘের ভেতরে এ্যাতো মেঘ ছিলো
কোনোদিন বুঝেছিলে তুমি ?

হয়তো আগামীকাল
দুজনে দুদিকে চলে যাবো।

কিন্তু আজ ?
আজ এই শান্ত স্থির বিকেলধেলায়

এসো গান শুনি।

পবিত্র বসু

লৌকিক

রাত হয়ে গেছে
ঠাণ্ডা শিরশিরে আলো দিচ্ছে চতুর্দশীর চাঁদ
শব্দ নেই, স্তব্ধতাও
ঠিকমত কিছুই করা হয় নি, ঘুমিয়ে পড়ার
আগে, তবু, ভাবি
সবই সারা হয়ে গেল
চলো এবার তবে ফেরা
চলো
এবার বেলাশেষের শীত আর দেয়ালের
লৌকিক সীমা ঘিরে লম্বালম্বি ঘুম,
স্মৃতি।

নির্মল হালদার

ডিমের পাখি

একটা ডিম
ঘরে যায় রান্নাঘরে যায়
একটা ডিম ফুটে গেলে একটা পাখি।
রান্নাঘর থেকে একটা পাখি
সাত-সকালের কাহিনী হ'য়ে উড়ে গেলে
আরও পাখি

পড়শী

দুই বাড়ীর মধ্যিখানে অনেক দেয়াল
কেউ কোনোদিন ডিঙিয়ে গেল না
তবে এই বাড়ীর রান্নার গন্ধ ঐ বাড়ীতে ছুটে যায়
ঐ বাড়ীর ছেলের কান্না এই বাড়ীতে ছুটে এলে
আমরা বুঝি এই আমাদের সুসংবাদ
আমরা আছি

ব্যাঙ

এক বালতি জলের সঙ্গে একটা ব্যাঙ উঠে এলে
ব্যাঙ কি ডাকবে ?
ব্যাঙ ডাকলেই আমি সাড়া দেবো
আমি ডাকলে ব্যাঙ কি লাফাবে ?

কুয়ো থেকে এক বালতি জলের সঙ্গে
একটা ব্যাঙ ঘরে এলে
ব্যাঙের কি পছন্দ হবে ঘরের আলো ঘরের আঁধার

অমিতাভ মৈত্র

মনে রেখো

মনে রেখো এই তীব্র দিনগুলোর কথা, যা বেরিয়ে আসতে
আমরা চাইনি কখনোই।

তেমন ভালো পোষাক ছিল না আমাদের
তেমন কোন বন্ধুও ছিল না।
ছিল অপমান আর টাকাকড়ি না থাকার কষ্ট
আর এক অপ্রাকৃত যুদ্ধ খাবার এবং ভাষা নিয়ে।

আমরা হাসতে হাসতে উঠে যেতাম লিফটে
খামোখা, বোকার মতো, নেমে আসতাম আবার।

নতুন মানুষ, তোমরা
মনে রেখো এই অদ্ভুত দিনগুলোর কথা। এখানে
আমাদের উপহার দেওয়া হতো দেশলাই, শুধু দেশলাই
আর গোটা শহর অপেক্ষা করে থাকতো বিস্ফোরণের জন্য।

আভজ্ঞতা

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে এই অগ্নি, এই শস্যের দেবতা
আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে এই দারুপ্রতিমা, এই লৌকিক টোটেম
যা কিছু অস্পষ্ট, কোলাহলময়, তাকে আমরা বর্জন করতে শিখেছি
আর ঘৃণা থেকে তৈরী করে নিয়েছি সংঘ এবং হলুদ শিল্প
আমরা বেঁচে আছি অন্ধের মতো, চিৎকৃত ভিক্ষুকের মতো
আর চমৎকার ভাবে অপেক্ষা করছি নতুন কবিতার জন্য

হায়, কি অসহায় ভাবে অপেক্ষা করছি !

অনুভব সরকার

বিশ্বসংবাদ

বাবা শোনেন 'বি, বি, সি'
বাবা শোনেন 'ভয়েজ অব্ আমেরিকা'
সারারাত মশারিতে বাবা ও রেডিও
আলনায় বাবার প্যান্ট, বাবার জামা ও গেঞ্জি
খাটের তলায় খুলে রাখা বাবার চটি

এভাবে একটা করে রাত ফিরে যায়
এভাবে একটা করে সকাল ফিরে আসে
বাবা চা'য়ের কাপে ছুঁড়ে দেন বিশ্বসংবাদ
সেই সংবাদ চা'য়ে ভিজিয়ে আমরা খেতে থাকি

নিত্য মালাকার

শুধু ছবি

আজও সে আমার হাতে—উচ্ছিষ্ট আপেল,
সত্তর দশক থেকে ছুটে এসেছিল কোন্ অর্ধমনস্ক পাখি
দক্ষিণ দুয়ার আমার খোলা ছিল, রাবীন্দ্রিক
বিশ্বস্ত আর কিছু এলোমেলো হাওয়া আর গ্রাম নিয়ে
শীতের প্রখর রাতে যখন ভেবেছি, ভয় নেই—
জেগে দেখি বারান্দায় ভুক্তাবশিষ্ট ফল
করুণ যৌনতা হয়ে মিশে আছে

বিকার ও পচন থেকে তুলে নিয়ে আমি তাকে
সেই যে নিয়েছি হাতে
আজ মধ্যআশির এই বর্ষার ছেঁড়াফাড়া রাতে
অভ্যাস ও লোভে প'ড়ে ঠুকরে খাই—আস্বাদ

আর জল কাদা খিঁচ ভেঙে সেই পাষাণ বা বায়বীয়
বুকের খোদলে ঢুকে ফিসফাস করে,
'শয়তানকে পেলে হয়'

স্মিত বুদ্ধশ্বাস আমি হাসি,—জীবনানন্দের চেয়ে
একটু তফাতে ॥

এবার শীতে

আরো ভেতরে লুকোতে হবে মুখ
আরো ছাড়তে হবে শব্দযুগ্মক কিম্বা পয়ারের ফাঁকি চাল দীর্ঘ বা খাটো
আরো ভেতর হয়ে ঢুকে যেতে হবে নিচে মানুষের ঘরবাড়ি
বানানো হবে না
যখনি এগোই পথে দেখি শুধু সভ্যতা একেও এড়াতে হবে
দিতে হবে মার
নদীর শব্দের কথায় আর পেট ভরবে না ব'লে মানুষ কাটছে খাল
আমিও কুমীর ন্যমাবো খুব শিগ্‌গিরই, মানুষের দুঃখবাদ আছে
পণ্ডিত ও জরদ্‌গবের কাছে হিপোপোটামাস কাঁদে কখনো অজ্ঞাতে
এবার স্বপ্নে আমি আলো হাতে ঘুমিয়ে পড়বো পাশে
নদীর বিকল্প ঐ আলপথে

ঐতিহাসিক এক সন্ধানী শাবল হাতে প্রতি ইঞ্চি মেদিনীকে
বিস্ফারিত হতে দেখে যে-আনন্দ পাবো আমি
তার কিছু কটুভাগ কলমকে দেবো
কলম জানে না কথা শুধুই লাফায় বলে সরস্বতীকে বেশ
লোভ করে পেতে চায়
এসব ছাড়তে হবে—
আরও ছাড়তে হবে মোহ্যমানতা আর সীবনশিল্পের সুখ
নতহাসি

খোড়ো চালে মাটির দেয়াল মেঘ, স্বপ্নহীন যেভাবে এঁকেছে গান
ভগ্নরেখা শালগাছ রাঢ়দেশ তালজঙ্ঘা
সংসারে আধেকলীনা স্তন আর বোঝা
এবার শীতে কি আমি সেই দেশে চলে যাবো
ভেবেও দেখবো না আর
শিক্ষায়তনের দেশে ফিরে আসবো না ॥

মৃণালেন্দু দাস

আফ্রিকা

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সেঁচে, সাত রাজার ধন এক মাণিক
এনে দিল দুঃখিনী মাকে। রোদে বসার শিশুকাঠের পিঁড়ে
বানে ভেলাভাসানোর সেঁউতি ঃ
এমনি করে সে বিশ্বসংসার সাজিয়ে দিল
মায়ের চারদিকে।
পুবে সূর্য্য, পশ্চিমে চাঁদ, উত্তরে গিরিরাজ ;
আর দক্ষিণে—কালো মানুষের দেশ
আফ্রিকা।

মা চুল বাঁধতে পুবে যান, পিদিম জ্বালতে
পশ্চিমে। উত্তুরে তার জ্ঞাতি ভাইয়ের বাড়ি
সম্বৎসর সেখানে মধুমাস।

দক্ষিণে আজও তার যাওয়া হয়নি।
এবার হয়তো যেতেই হবে—
বউটা পোয়াতি, তার ওপর
ভরামাস।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

চৈত্রলেখা

এখন '৮৬ সাল, আজ চৈত্রপ্রথম। কবিতা নয়—সাহিত্যের প্রতিই আজকের মানুষ ততো আকর্ষণ বোধ করে না—করার কথাও নয়। প্রতিকার বা সুব্যবস্থা চাই লোকজনের—না হলে অন্তত গড়পড়তা প্রতিকার, পুলটিশ, অন্তত কারখানায় কাজ করার পিতলতকমা কোনো। দিনের পর দিন বাড়ছে গভর্ণমেণ্টের সমাজ, যা রুটি ও সার্কাস দেয়, দেয় কিউ, টি ভি, বিকল টেলিফোন, বামপন্থী কবিতা-গল্প-উপন্যাস-সেমিনার-রিপোর্টিং-এর মতো ক্ষোভশোষককেও যা চমৎকার চিনে নিতে পেরেছে অনুদানসহ।

নিজেদের দিকেই তাকিয়ে দেখি, গর্বিত নয়, (যেমন বলা হয়ে থাকে) কিন্তু সাধারণ কয়েকটা প্রশ্ন করা ঘাড়গুলি আজ নুইয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে জানি যে গত ৮৫ থেকে লেখার ফ্যাশন কমে এসেছে অনেকেরই ; জানিনা—হয়তো সবারই—এক ব্যক্তিগত রূপকথাবয়নে যাঁরা বাঁতভয়, তাঁরা ছাড়া। এই গোত্রের লেখক ছাড়া বাকি প্রত্যেককেই ছুঁয়ে যায় খণ্ডপৃথিবীর সামাজিকতা, তাই হয়তো বাংলা নব্বই-এর দশকে এই দ্রুতাপসারণ, চিত্রস্তব্ধতা।

নাকি বাংলাদেশের আত্মা-ই হঠে গিয়েছে ? সংস্কৃতি, যার প্রথমপ্রমাণ বেশপসন্দ্ আর আহার্যরোচনা, তা যে হঠে গিয়েছিল অনেক আগেই তা তো জানতাম। এখন কি মানতে হবে যে আমাদের দেশ বাংলা নয়, ভারতবর্ষ, হুগলি নদীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'বাংলা' এই কোম্পানির পাট ফুরোলো, বাংলা বলতে এখন থেকে শিল্পে-মনে-হৃদয়ে এক কেঁচে-গণ্ডুষ করা তোতাপাখি পুববাংলাকেই বোঝাবে, রাষ্ট্রোৎপত্তির নিয়মবশত যার শিল্পে কোনো অধিকারই নেই ?

একথা ঠিক যে আমাদের, সংবাদপত্রকুলীনপরবর্তীদের, ভুল পর্বতপ্রমাণ ; আজো আমরা কবিতার বইয়ের বিজ্ঞাপনে 'দারুণ মাস্তুলের নাবিক' প্রভৃতি লিখি যেখান থেকে বোঝা যায় কবিয়াল সম্পর্কে হোঁৎকা-খোকা আবেগ আমাদের অধিকাংশের মধ্যেই দুর্মোচ্য, এমন কি, একটু নতুন বিজ্ঞাপনরীতির উদ্ভাবনাকেও তার জন্যে আমরা সরিয়ে রাখছি ! ('মাস্তুলের নাবিক'—এই শব্দবন্ধে আমার আপত্তি ছিল না, কেননা বইটি জয় গোস্বামীর, আমরা সকলেই জানি জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়—৭৮/৭৯ থেকেই—সাম্প্রতিক নদীয়া জেলার আত্মা, যে নদীয়ার নিকট ব্যাণ্ডেল এক অলৌকিক মাস্তুলের জন্যে খ্যাত। 'দারুণ' লাগিয়ে এটি বিপথগামী হয়েছে।) এ জিনিশ আমি দীর্ঘদিন ধ'রে দেখছি যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা র‍্যাঁবো-রিলকে-এলিয়টের মতো লেখার এবং একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা, সুকান্ত/নজরুল কি সুভাষ / নীরেন্দ্রর মতো সভাপ্রতিপত্তি অর্জন করার। এসব একসঙ্গে হয় না—এটুকু দশকী কবিদেরও (যাঁরা একদশকের চিহ্নিত হয়ে থাকলেই তৃপ্তি পাবেন) বোঝার সময় এসেছে।

এটা বলার থাকেই যে তবু এইসব এলেবেলে কাজের কারণ অনেকটাই রাজনৈতিক হতাশা এবং পূর্বসংস্কৃতির প্রস্থান। ১৯৭৪-এর যে কোনো কবিতাপত্রিকা এবং '৮৫-র কোনো কবিতাপত্রিকা হাতে নিলেই বোঝা যাবে অন্য একটি সম্ভবপর স্বরায়ণ খোঁজার কাজটা এখন অনেক বেশি—কবিতায়, আভিধানিক অর্থে, ইতরতা, অনেক বাড়ছে ! অর্থাৎ কবিদের দায়ে প'ড়ে বুঝতে হয়েছে যে লুম্পেনরাও সত্যে অধিষ্ঠিত, এবং যে বিদ্যাবিলাসের বিদ্যুতে প্রায় ৮০ অবধি অন্ধ থাকা গিয়েছিল (কুত্তকাইট বা কাফকালাঞ্ছন, যাই হোক না কেন সেই বিদ্যাবিলাস) তা এখনকার পাঠককে বড় স্পর্শ করবে না আর, কলকাতায় তেমন বই আসে না, লাইব্রেরিগুলি লুণ্ঠিত, ছাত্র-অধ্যাপক সকলেই জীবিকাগরজে তথা সামাজিক দায়িত্ব ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত, ব্যক্তিগত একটি সন্ধ্যা কাটাতে গেলে আজ মফস্বলেও সুযোগ পাওয়া যায় না।

কোনো আনন্দিত অশান্তির দিকে এগিয়ে যাবার পথ আজ আর খোলা নয়—কবিদের সামনেও নেই—ইংরাজি একটি দশকের মাথার দিকে লেখাপত্র না ছাপিয়ে ফেলতে পারলে সেই দশকটাই তাঁদের মিস্ ক'রে যেতে হয়।

এমন কি, যাঁরা আমাদের মতো মৌলিক নয়—পূর্বকথিত সেই সংবাদপত্রকুলীনদের কথা বলছি—রাংতামোড়ক বাদ দিলে তাঁদের কারোরই এমন কোনো সিদ্ধি নেই যার প্রতিকূলে বা ভিন্নমেরুতে তড়পে চাষবাস করা যায়।

ঠিক এই সময়ই হচ্ছে ছন্দে নর্তনশীল কবিতার। পয়ার / অক্ষরবৃত্ত একসময় গদ্য / রিপোর্টাজের কাজ করতো, কমার্সের ভাষায় বলি, হেলড্ ; অর্থাৎ, এটা একটু মনে রাখুন। অনেকক্ষণ ধরে এই নিবন্ধটির প্রথমে যে লোকগাথা আমি লিখে এলাম তা সকলেই জানেন এবং দেশাত্মা, সংস্কৃতিপ্রস্থান প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ে যে কোনো কবিকেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়—পরামর্শের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমাদের এগোনো যখন রুখে গিয়েছে তখন ঐ একটি ছবিই আমার চোখে ভেসে উঠলো। তরুণ নিরঞ্জনার্থীদের ছবি। যখন তাদের আটকে থাকতে হয়, তারা নাচে। পথ পেলে, চলে।

প্রতিমা তবু একসময় গঙ্গা পায়, কবিতাও পাবে নাকি ? পায়নি অন্তত এ পর্যন্ত।

কিংবা পায়—সম্পূর্ণ নতুন কবিতাপ্রতিমা জেগে ওঠে। কিন্তু, কবিদের সঙ্গে নিরঞ্জনার্থীদের তুলনায় / উপমায়, ভুল করিনি, 'নিরঞ্জন' শব্দটিকে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে। 'নাচুনে ছন্দের' কবিতার নিন্দা আমি ঢের শুনেছি এবং এর সমর্থনে নানাপ্রকার ওকালতি করার ইচ্ছে আমার নেই ; মাত্র এইটেই বলার আছে যে আরো যে প্রবলতর স্বর সন্ধান করা হচ্ছে, নর্তনরত ছন্দের দিকে আরো প্রবলবেগে না গেলে সেটা একটা ব্যঙ্গময় তিক্ত বক্তৃতা হয়েই থাকবে।

এই কথা এখনো বলতে চাইছি না যে ধ্বনিপ্রধান—শ্বাসাঘাতপ্রধানরাই বাংলা কবিতার চূড়ান্ত যুবিকুইটিঃ নাচ / নর্তক সম্পর্কে পোল ভালেরির চরিত্রমুখের ব্যাখ্যা, He is not here / He is not there—এই প্রস্তাবনা, যদিও এ কথার সমর্থনে যেতেই। বাংলা কবি ও কবিতাকে যদি প্রায়লুপ্ত হয়ে-না-যেতে হয় তাহলে প্রদর্শনবাদিতার বাজারে তাকেও আসতে হবে, যাকে কোনো একটি সাক্ষাৎকারে সুনীল সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন 'প্রফেশনাল' ব'লে। আর, কবিতার অন্যান্য অঙ্গের থেকে, সবথেকে সহজে, এমন কি সভাপাঠের দূরত্বেও এই তথাকথিত 'নাচুনে' ছন্দই প্রাণগম্য, এটা কবি ও পাঠকরা জানেন। কিন্তু, কবিরা আরো জানেন, কপট কবিতার পক্ষে এই ছন্দসূত্র হন্তারক—ব্রাত্যতার পৌরোহিত্যই এর কাজ, যে কাজ ব্রাহ্মণ্য অক্ষরবৃত্ত / পয়ারের নয়।

এই মুহূর্তে দুটি পদ্যগ্রন্থের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন ঃ উৎপলকুমার বসু
গুহা মানুষের গান ঃ অরুণেশ ঘোষ

নির্বাচিত অরণি বসু

সত্তরের শুরুতেই আমরা একসঙ্গে একঝাঁক তরতাজা তরুণ কবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। একেবারে শুরু থেকেই তাঁরা আমাদের নজর কেড়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁদের অনেকেই এখনও যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছেন এবং নিজেদের ক্রমশই প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন তাঁদের কবিতার মাধ্যমে। কিন্তু কেউ কেউ আর ততটা সক্রিয় নেই। তাঁদের লেখা সচরাচর চোখেই পড়ে না। কোথাও কখনো হঠাৎ একটা দুটো কবিতা ছাপা হলে তা বেশ কৌতূহল নিয়ে পড়ে দেখি। মনে হয়, এই বুঝি আবার এঁরা ফিরে আসছেন। যদি আসেন, তো তাঁদের আমি সাগ্রহে গ্রহণ করে নেব—এরকম ভাবি। অরণি বসু এঁদেরই একজন।

মনে পড়ে, বীতশোক ভট্টাচার্য'র কথা ? সত্তর দশকের শেষ অবধি বীতশোক ছিলেন ঝলমলে, প্রাণবন্ত, নিষ্ঠাবান, সক্রিয়। গত দশকের শেষদিক থেকেই তিনি ক্রমশ যেন পচ্ছদের আড়ালে চলে গেলেন। মনে হয়, বুঝিবা নতুন কোনো ধ্যানে, তন্ময়তায় এখন তিনি মগ্ন রয়েছেন হয়ত, তাই এই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা। আবার ঠিক বীতশোকের মতই ফিরে আসবেন বীতশোক। ধরা যাক হেমন্ত আঢ্যের কথাই, কত স্বতন্ত্র ভাব ও ভাষা নিয়ে ও এসেছিল আমাদের কাছে, কিছুদিন হেমন্ত-বাতাস ছড়িয়ে, তারপর এক গভীর অজ্ঞাতবাস। পুরুলিয়ার একটা কাগজে কয়েক টুকরো কবিতা পড়ে বেশ উৎফুল্ল হলাম, ভাবলাম, হেমন্ত আবার এসেছে। কিন্তু কই, আর তো হেমন্তকে চোখে পড়ছে না।

মনে আছে দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর কথা ? গদ্যে-পদ্যে এক সব্যসাচীর ভূমিকাতে তাকে পাওয়া যাবে, এরকমই তো আমরা একসময় ভেবেছিলাম, কিন্তু, দেবপ্রসাদও আমাদের ঠকিয়েছে। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন নগর থেকে 'দ্বন্দ্বশূক' নামে একটি তেজী কাগজ করতেন, এখনও মাঝেমাঝে কাগজটি বেরোয়। কবিতা লিখতেন রঞ্জন এক বেপরোয়া ভাব-ভাষায়। এখনও মাঝে মাঝে লেখেন, কিন্তু আরো বেশি বেশি তাকে পেতে চাই আমরা। এরকম অনেকের কথাই বলা যায়।

বীতশোকের একটি কাব্যগ্রন্থ আছে, পরমা প্রকাশ করেছে। একক কাব্যগ্রন্থ নয় 'তিনজন কবি'-র একজন হয়ে আছেন বীতশোক। তবু, সন্ধানীরা তাঁর একগুচ্ছ কবিতা সেখান থেকে পেয়ে যাবেন।

কিন্তু অরূণি বা হেমন্ত, দেবপ্রসাদ বা রঞ্জনের কোনো কাব্যগ্রন্থ আছে বলে আমি জানিনা। সম্ভবত নেই। এঁদের এক একটি কাব্যগ্রন্থ এতদিনে প্রকাশিত হতে পারত। আমরা যারা অভ্যাসবশত একমাত্র কবিতারই পাঠক, আমাদের কাছে এ অভাব বেশ বড় বলে মনে হয়।

এঁদের অন্তর্ধান হলে, বা এঁদের কোনো কাব্যগ্রন্থ কোনোদিনই প্রকাশিত না হলে, জগৎসংসারের তেমন কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই ঠিকই। ঠিকেদারী, দালালী, ভেজাল, ভোট, সিনেমা, থিয়েটার, ময়দান, মিছিল, মফঃস্বলের রথ, চড়ক, দোলযাত্রা সবই নিয়মিত চলতে থাকবে। মানুষের ভুলে থাকার, বেঁচে থাকার অনেক রসদ এসবের মধ্যে আছে। কিন্তু, আমার মতো যাঁরা কবিতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমিও কখনো কখনো হেমন্ত, অরূণি, দেবপ্রসাদ-দের কথা ভেবেছি। ভেবেছি এঁরা নিশ্চয় ফিরে আসবেন, সেই সত্তরের গোড়ার দিকের প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে।

অরূণি বসুর (১৯৬৮—'৭৮ এর) কিছু কবিতা এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

—দেবদাস আচার্য

প্রেম প্রসঙ্গে আরো একটি

এই যে সহস্রবার উচ্চরণ করো 'ভালোবাসো', কাব্যি ক'রে বলো, 'প্রেম'
ভালোবাসা কাকে বলে জানো নাকি ?
যে-যুবক যুবতীর কাঁধে হাত রেখে বলছে হাজার কথা
যে-যুবতী আঁকড়ে ধরেছে স্কুটার-চালক যুবকের পিঠ
তারা জানে ভালোবাসা কাকে বলে ?
আমিও ভেবেছি বারবার ভালোবাসা শব্দের মানে,
নারীর স্তনের দিকে চেয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়,
প্রেমিকার হাত ধ'রে রাস্তা পেরোতে পেরোতে হঠাৎ থমকে যাই একদিন,
আকাশের মেঘ উড়ে আসে মাথার ভিতরে, খেলা করে।
এই শহরের চতুর্দিকে অগুন্তি মানুষের সাথে অগুন্তি মানুষীর প্রেম
তারাও আমার মত মূর্খ, বোঝে শুধু সঙ্গসুখ, ভালোবাসার কিছুই বোঝে না।

অজ্ঞাতবাস

অস্থিরতা

প্রথমে পাথর ছুঁড়ে মারি আয়নায়, তারপর
টুকরো টুকরো কাঁচ ছড়িয়ে দি ঘরের ভিতরে ও বাইরে
কাগজ, কবিতা আর হিসেবের খাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে
জ্বালাই আগুন। ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না আমার।

বর্ষার পর আসে শরৎ। শরৎ-এর পর হেমন্ত ছোঁয়া শীত।
অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে থাকি। দেখি, পাখি উড়ে যায়।
দেখি, বাস ভর্তি মানুষেরা চলেছে অফিসে।
শীতকাল এলে যারা নৌকা করে পিকনিকে যায়, যারা যায় চিড়িয়াখানায়,
তারা সবাই আমারই মত ? না কি
মানুষের এই বিশাল সভায় আমি শুধু একাই দণ্ডিত ?

ঠেস

'তুমি মোটে আধুনিক নও'—এই ব'লে শিবানী নাচায় সকৌতুকে চোখ।
আমি নই প্রতিভা বিশেষ, নই তরঙ্গরাশির মত বিস্তৃত—
এই সব জানি, আরো জানি আধুনিক শব্দটি বড়ই রহস্যময়
জটিলতা তার নারী-নয়নের চেয়ে কিছু বেশি।

স্মিত হাসি আমি, হাত তুলে জানাই সম্ভাষণ,
বলি, আধুনিকতার তুমি বড় কাছাকাছি, সাবধানে থেকো।'

অবিস্মরণীয়াকে

কিছুই হয়না বলা, শুধু ছুটে আসি বারবার
বসে থাকি আর এলোমেলো কথা বলি,
বলি, বোনাসের কথা—এ বছর কত পার্সেন্ট ?
দূরে দূরে জেগে ওঠে কৌতূহলী চোখ আর
ভর্ৎসনার মত বেজে ওঠে টাইপরাইটার, খট্-খট্, খট্-খট্,
কত কি বলার ছিলো, ভাবি, একদিন···

তোমার ওই স্তব্ধ চোখে বিস্ময় কিছুই নেই আর
তবু কাছে এসে বসে থাকি, ভাবি,
তুমি কি ততটা দেবী, আমি যত পথের ভিখারী !

জীবন

এইরকমই মাঝে মাঝে কয়েক সপ্তাহ খুব মনোকষ্টে কাটে,
দিনের পর দিন অকারণে নিভে যায়,
জমে ওঠে ছাই।
তখনও আমি হাসি, তোমাদের সঙ্গেই পুরনো কথা শেষ করি,
বাড়ি ফিরে হাঁ ক'রে নিশ্বাস নিই, যা কিছু সুখ
সবই ঝরে যাচ্ছে জেনে কেঁদে উঠি হাড়ের গভীরে।

দিনের পর দিন, মাঝে মাঝে কয়েক সপ্তাহ এভাবেই কেটে যায়
একসময় রেগে উঠি,
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভর্ৎসনা করি, তারপর
আয়নায় টোকা মেরে বলি, চলো, আজ একটা সিনেমা দেখে আসি।

সমুদ্র '৭৫

কয়েক মুহূর্ত আমি স্তব্ধ হ'য়ে থাকি,
মনে হয়, ওই উদ্ধত জলরাশি সবকিছু গ্রাস করে নেবে,
মানুষের লঘু কলরব, গাঢ় প্রেম, পাপ ও সংগীত।

সমুদ্র নেয়না কিছু, ঢেউ বারবার আসে, ঢেউ বারবার ফিরে যায়
অতি পরিচিত ঝাউবন অবিকল থাকে, যেরকম বিজ্ঞাপনে।
আমি তো মানুষ, তাই দুহাত ছড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলি,
'অন্তত আমাকে নাও, নিয়ে যাও'।

নেয়না কিছুই, কয়েকটি পল শুধু স্তব্ধ হ'য়ে থাকে,
পায়ের তলার বালি তেতে ওঠে, আর
আমার শরীর জুড়ে জেগে ওঠে সমুদ্র স্নানের যত লবণাক্ত স্মৃতি।

মায়াজাল

ঘন উচ্ছ্বাস হঠাৎ তরল হয়ে আসে এক সন্ধ্যেবেলায়,
নভেম্বরের থেকে ঝরে পড়ে যখন আষাঢ়,
বরুণার কথা মনে পড়ে খুব, হেঁচে হয়।

সন্ধ্যেবেলায় স্তব্ধ ঘরের দুঃখে ও রাগে, ঝনাৎ শব্দে
ভেঙে যায় সব কাঁচের গেলাস, এখন বরুণা অচেনা রমণী,
তুমি যে কোথায় ! বড় সাধ জাগে খেলা করি আজ।
পরের বাগান থেকে তুলে আনি কাগজের ফুল
নিভৃতে তোমার খোঁপায় জড়াই, উড়ে যাবে দূরে
লঘু আপত্তি আঙুলের চাপে, এই তো সময়,
বরুণা, আমার, কাল বসন্ত—বাইরে আষাঢ়, মুখ তুলে যদি
চোখে রাখো চোখ, হাসনুহানা পড়বে কি ঝরে ?
বিকেলবেলার অমন যে হাওয়া হঠাৎ উধাও হ'ল কোনদিকে
এখন শুধুই আমার হৃদয়, আকাশে বাতাসে বৃষ্টিতে ভেজা
বরুণার কথা, বরুণা তোমার সময় হবে কি ?

মহাপৃথিবী

হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে আসি আমি। হাসতে হাসতে আবার ঢুকে পড়ি ঘরের ভেতরে। হাসতে থাকে আমার স্ত্রী ও সন্তান। হাসতে হাসতে চোখে জল এলে কষ্ট হয় খুব। তখন থমকে যায় দৃশ্য। আমার স্ত্রী থমথমে গলায় বলে ওঠে, 'আমার স্বর্ণবলয় কই ? আমার কঙ্কন ?' আমার রোগা ছেলে চিৎকার ক'রে বলে, 'আমার চওড়া বেল্ট ?' কয়েক মুহূর্ত আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। তারপর আবার হাসতে থাকি। হাসতে থাকে আমার স্ত্রী ও সন্তান। হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে যাই আমি। কুঁজো হয়ে যায় আমার বউ আর ছেলে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসি আমরা। আবার ঘরে। আমাদের চোখের কোণে টলমল করে ওঠে জল।

শব্দবন্দী

অনেক দূরের রাধানগরের থেকে দেবদাস পাঠায় 'ভাইরাস'।
পুরুলিয়া থেকে নির্মল পাঠায় অনেক, অনেক চিঠি, পাঠায় কাগজ।
দূর-দূরান্তর থেকে কালো শব্দেরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে,
শব্দবন্দী আমি একা একা বসে টের পাই আমাদের বিশাল ব্যর্থতা।
গ্রাম ও গঞ্জের কোণে কোণে জ্বলে উঠছে মণীষা
জ্বলে উঠছে মশাল, আর
এই শহরে কি করছি আমরা ?
উবু হয়ে বসে আছি রাস্তায়, বিখ্যাত হবো ব'লে,

বিখ্যাত হবার জন্যে নাক দিয়ে লিখছি কবিতা
পা দিয়ে কামাচ্ছি দাড়ি।
অজস্র ঢাকের শব্দে ভ'রে উঠছে শহর ;
ঢাকের দড়ির চাপে কাঁধ ফেটে বেরিয়ে আসছে রক্ত,
উড়ে আসছে মাছির দল কালো ও পচা রক্তের লোভে।

রাজা, যাদুকর ও ভিখারী

প্রচণ্ড ক্রোধের শলা আমার পায়ের তলায়, তবু আমি শূলবিদ্ধ হবো না
এফোঁড়-ওফোঁড়
রাজা, আমি ভয় পাবো না তোমার বোহিসেবী ভ্রুবিলাসে।

যাদুসম্রাটের একান্ত সহচরের মত নির্ভয়ে উপোসী তরবারির ওপর দিয়ে
হেঁটে যাবো আমি,
তোমার বিস্ফারিত চোখের সামনে ফাটাবো ব্যঙ্গের রং-বেরং বেলুন।
তুমি তো জানো, আমি অনায়াসে পাতালে পা'র তালাবদ্ধ সিন্দুকের
গোপন গহ্বর থেকে
কাগজের অর্থব টুকরো থেকে আমিই তো বানাই তোমার প্রিয় ফুল,
তুমি বারবার হাতসাফাই ধ'রতে গিয়ে জটিল ধাঁধার মধ্যে ঢুকে যাও
ক্রমশই ডুবে যাও জটিলতার বিষম আবর্তে।
শেষে বশংবদ চাকরের মত জানু মুড়ে বসো টেবিলের নিচে
আমার করুণায় কৃতার্থ হয়ে ওঠো তুমি—
ছুটে পা ধোবার জল এনে দাও,
অথচ তুমিই রাজা, আমি শুধুই পেশাদার বিদেশী যাদুকর।

আমি প্রত্যুষে তোমার রাণীর বুকের গোলাপ ছিঁড়ে আনি,
তুমি বাধা দাওনা, বাজাও না কারাগারের রহস্যময় পাগলা ঘণ্টি ;
আমি যে ভয় পাইনা তোমার বোহিসেবী ভ্রুবিলাসে
ভয় পাইনা ওপরওলার রক্তচক্ষু।
ধুরন্ধর যাদুকর আমি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়েও
ডরাই কেবল নিঃস্ব ভিখারীকে।

তাঁহাদের প্রতি

আধার অম্বরে বড় কলরোল জেগে ওঠে, যারা ছিলো একদিন
যারা নেই, যারা সব মিলে আছে পঞ্চভূতে, হাওয়ায়—হাওয়ায়,
বিশাল জলের পাড়ে উঠে আসে, চেপে ধরে সনির্বন্ধ হাত,
বলে 'চলো, আজ আমাদের দেশে।'
আমি তো ঘাটের কাছে বসে আছি, ঘাটের রানায়
দুলিয়ে নশ্বর পা দুখানি—
এইসব ছেড়ে যেতে হবে বলে অভিমানে ঠোঁট ফুলে ওঠে একদিন,
একদিন বড় সাধ জাগে প্রাণে,
ইচ্ছে হয়, যাই তোমাদের গ্রামে, মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে
আজো কিরকম আছো, দেখে আসি।

Space donated by :

A
Well Wisher

সুজিত সরকার

রিলকের গোলাপ

মৃত্যুর পনেরো মাস আগে রিলকে নিজেই রচনা করেছিলেন তাঁর এপিটাফ এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে তাঁর সমাধিপ্রস্তরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর এপিটাফ। বহু বাঙালী কবিই রিলকের এপিটাফ অনুবাদ করেছেন। আমার হাতের কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ দুটি। 'গোলাপ, পবিত্র বিরোধ তুমি, এত সব / চোখের পাতায় থেকে কারো ঘুম না-হবার / সুখ' —এই হলো শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ। আর, অলোকরঞ্জনের অনুবাদঃ 'বিশুদ্ধ বিরোধাভাস, হে গোলাপ, সকলের চোখের পাতায় / রাজো, তবু নও কারো ঘুম নও, সেই বুঝি সুখ !!' শঙ্খ ও অলোকরঞ্জন দুজনেই লিখেছেন 'সুখ', কিন্তু জন মুড, যিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় জুড়ে রিলকে পড়েছেন ও পড়িয়েছেন, তাঁর ইংরাজী অনুবাদে লিখেছেন 'desire'। লক্ষণীয় এই যে, রিলকের এপিটাফে কোথাও 'মৃত্যু' শব্দটি নেই। আছে গোলাপ ও তার পবিত্র বিরোধের কথা, ঘুম ও ঘুম-না-হওয়ার ইচ্ছার কথা। পৃথিবীতে এমন কবির সংখ্যা খুব কম, যাঁরা গোলাপ নিয়ে কখনো কোনো কবিতা লেখেন নি অথবা যাঁদের সমগ্র কাব্যে অন্ততঃ একটি পংক্তিতে গোলাপের উল্লেখ নেই। আমরা রবার্ট বার্ণসের গোলাপকে জানি, ফ্রস্টের গোলাপকে জানি, ইয়েটসের গোলাপকে জানি, ব্লেকের রুগ্ন গোলাপকে জানি, হিমেনেথের পরমা গোলাপকে জানি। কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, রিলকের মতো আর কেউই বোধহয় গোলাপকে এত গভীরভাবে দেখেন নি। কোন্ কথা ব'লে যায় রিলকের গোলাপ ? ভালোবাসার কথা, আবার মৃত্যুরও কথা। যে প্রেমিক প্রিয়তমার হাতে তুলে দেয় গোলাপ, সে গোলাপ শুধুই ভালোবাসার গোলাপ নয়, মৃত্যুর গোলাপও বটে। ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মৃত্যুচেতনা। রিলকে এরকমই ভেবেছিলেন। আবার ভালোবাসা মানে জীবন। সুতরাং, গোলাপ তাই, যা, জীবন ও মৃত্যুকে মিলিয়ে দেয়। আমরা জানি, মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ মনে করেন নি রিলকে। মৃত্যু, রিলকের কাছে, চিরবর্তমান 'other side of life' ; মৃত্যু, জীবনের উৎসবে-অনুষ্ঠানে এক নিঃশব্দ অতিথি। মৃত্যু 'রূপান্তর', 'নিবিড়প্রচ্ছন্ন পরিপূর্ণতা'। তাই, রিলকের গোলাপ একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু। বোঝা যায়, কেন রিলকে গোলাপকে বলেছেন 'পবিত্র বিরোধ'। গোলাপের কাঁটা ও গোলাপের সৌন্দর্যের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, এ বিরোধ সে বিরোধ নয়। এই বিরোধ রয়েছে ফুটে থাকা গোলাপের নিজের ভিতরেই। তার একই সঙ্গে ঘুমনো ও জেগে থাকার ভিতরেই। চোখের পাতা ঠিক যেন গোলাপের পাপড়ি। গোলাপের পাপড়িগুলি একটি আরেকটির ওপরে এমনভাবে থাকে, যেন মনে হয়, গোলাপের ভিতরে রয়ে গেছে এক রহস্যময় স্তব্ধতা। মনে হয়, গোলাপের ভিতরে রয়ে গেছে ঘুম,

যার অন্য নাম, কবিতায়, মৃত্যু। অথচ গোলাপ তো ফুটেই আছে। তার এই ফুটে থাকাই তো জেগে থাকা। গোলাপের এই জাগরণ, এরই নাম তো ভালোবাসা কিংবা জীবন। বোঝা যায়, কেন রিলকে বলেছেন, 'সকলের চোখের পাতায় রাজো, তবু নও কারো ঘুম নয়।'

একটি কবিতা লেখার জন্য কত কিছু দেখে নিতে হবে আমাদের, ভেবেছিলেন রিলকে। দেখে নিতে হবে কত শহর, কত মানুষ, কত বস্তু, জেনে নিতে হবে কত প্রাণীর কথা, কত পাখীর কথা, কত ছোট ছোট ফুলের কথা, যারা সূর্যালোকে একটু একটু ক'রে খুলে যায়, অর্জন করতে হবে কত অভিজ্ঞতা, ভাবতে হবে শৈশবের কথা, শৈশবের অসুস্থতার কথা, যে অসুস্থতা প্রত্যেক শিশুকে একটু একটু ক'রে পরিণত ক'রে তোলে, ভাবতে হবে ভালোবাসার জোৎস্নায় ভিজে যাওয়া কত রাত্রির কথা, যার কোনোটাই একটি অপরটির মতো নয়, দাঁড়াতে হবে কত মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের পাশে, কত মৃতের পাশে, জমা করতে হবে কত স্মৃতি, আবার ভুলতে হবে, তারপর অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে আবার সেই সব স্মৃতির প্রত্যাবর্তনের জন্য। এত কিছু করার পর সারা জীবনে হয়তো একজনের পক্ষে দশটি ভালো লাইন লেখা সম্ভব। আমরা লক্ষ্য করবো, রিলকের এপিটাফে দশ লাইন নয়, দশটির চেয়ে কিছু বেশি মাত্র শব্দ আছে, যার ভিতরে রিলকের সারা জীবনের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি সম্পূর্ণ কবিতা নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ হলো সেই কবিতা, যা, জন মুডের ভাষায়, 'the one poem that each poet seeks'। এ গোলাপ যেন রিলকের হৃদয়, যা, জীবন ও মৃত্যুর ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছে—এ গোলাপ যেন রিলকে নিজেই, যিনি জীবন ও মৃত্যুর চিরন্তন বিরোধের অবসান চেয়েছিলেন—এ গোলাপ যেন রিলকের সমগ্র কবিতা। আনন্দ লাগে, অলোকরঞ্জন আমাদের জানান, সুইজারল্যাণ্ডের যে গ্রামটিতে রিলকের মৃত্যু হয়েছিল, সেখানে নতুন রকমের একটি গোলাপ কষিত হচ্ছে, যার নাম 'রাইনার মারিয়া রিলকে'। 'এই গোলাপের রং হবে কমলা-রাঙা, ইয়োরোপের দারুণ শীত আর ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও সে কেবলই বেড়ে উঠবে, বেড়ে উঠতে থাকবে।'

নীলকান্ত রায়

কবিতার দুঃখ কষ্ট, রক্তপাত

কি নিয়ে কবিতা লিখব, অতঃপর এই ভেবে কবিতা লিখিনা ইদানিং

পবিত্র অক্ষর নিয়ে চতুর্দিকে অশুচি শব্দের বড় ভিড়,
অক্ষম জারজ দুঃখে কবিতার মাঠঘাট অপবিত্র করেছেন—
এর বিরুদ্ধে সাহসী যুবতী প্রয়োজন।
যেহেতু বিষয় থেকে বস্তুকে বাদ দিয়ে কবিতা কবিতা করা—
নির্মাস্তিষ্ক মহিলার নিরেট শরীরে
প্যাড কিংবা রা সর্বস্ব আবক্ষ জানুর মধ্যে মধ্যরাত্রে তালমাতাল—
ইহাই কবিতা।

পবিত্র অক্ষর নিয়ে চতুর্দিকে ইদানিং অশুচি শব্দের বড় ভিড়।
কবিতা যে লিখব, কিন্তু কার জন্যে ?
না হয় বা চাঁদা তুলে, বোনাস, এ্যাডভান্স কিংবা যাই হোক
চল-অচল ঝড়তি পড়তি মুদ্রাগুলি দিয়ে
পদ্যের কাগজ একটা বের করা—
আন্দোলন-টান্দোলন, নবস্রোত, ইত্যাদি বিজ্ঞপ্তি যথারীতি
অবশেষে রেস্তোরাঁ বা কলেজ স্ট্রীটের এই তাড়ির দোকানে সারা সন্ধ্যা
সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ইন্‌টেলেকচুয়াল্ সেজে
সারা দুপুর চেঁচিয়েছি রাস্তার মোড়ে মোড়ে
ভদ্রমহোদয়গণ, কবিতা পড়ুন আরো, অপরকে পড়ান
নাহলে বেচারা আমরা মারা যাই পথে ঘাটে না খেয়ে শুকিয়ে
নাহলে পুলিশ দিয়ে বাধ্য করে কবিতা পড়াব
না হলে সবাই মিলে দাড়ি রেখে, চেঁচিয়ে, কি ঝগড়া করে
সত্যি সত্যি আন্দোলন ঘটিয়েছি ল্যাম্পপোস্ট উপড়িয়ে
মলয় বা সুবিমল জেলে গেছি
কেউ পালিয়েছি মুচলেকা দিয়ে—
সত্যি সত্যি আন্দোলন পোস্টারে-ব্যানারে !
অতঃপর, হা ঈশ্বর, অতঃপর !

পবিত্র অক্ষর নিয়ে চতুর্দিকে অশুচি শব্দের বড় ভিড়।

সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে ইদানিং জটিল ভাঙন।

হাজার বছর ধরে পথ হাঁটব, হা ঈশ্বর,
তিরিশে প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তি, পঞ্চাশে নিঃশেষ।
বনলতা সেন নাম্নী একজন মহিলা দেখি ট্রামের ভিড়ের মধ্যে
দুমড়ে যাচ্ছে মুচড়ে যাচ্ছে—
শ্রাবস্তীর কারুকার্য মুখ তার ঘেমে যাচ্ছে নেয়ে যাচ্ছে বিবর্ণ অসুখে
করুণ শঙ্খের মত স্তন জুড়ে অন্ধকার ছেয়ে আসছে অশ্লীল নিশীথে।

শুনছিলাম, আপনি নাকি কবিতার প্রিয় ভক্ত
আপনাকেই নিয়ে আজকে কবিতার দুঃখ কষ্ট খোলাখুলি গল্প করি
আসলে কষ্টের গল্প, ভীষণ কষ্টের।
কবিতা, বিবাহ, প্রেম এ সবের প্রলোভনে আপনারই মতন
ভালবাসাহীনতায় নিরক্ত দুঃখময় আমারও অসুখ।
সুন্দর কবিতা লিখতে, সুন্দরী মহিলা নিয়ে ভালবাসাবাসি
সদিচ্ছা লালন করি বদ্ধ ঘরে বহুকাল ঘুমহীন মধ্যরাত্রে, একা—
আসলে স্বপ্নশ্রী রমণী কেউ এখনো এলো না
আসলে পবিত্র কবিতা, হায়, এখনো লিখিনি
আসলে সুদর্শনা মহিলার সৌন্দর্য ভীষণভাবে দুর্বল করেছে
আসলে উজ্জ্বল কবিতা লিখতে ক্লান্ত হই, ক্লান্ত, ক্লান্ত—
অক্ষম পৌরুষ।
প্রকৃত প্রস্তাবে তাই রমণীর জন্য যত রাত্রি কাটিয়েছি
তারও চেয়ে ঢের কষ্ট কবিতা বিষয়ে।

কবিতার জন্য আর কবিতা যে নয়, সে তো
বহুদিন মীমাংসিত অকবি ও কবির লড়াইয়ে।
অথচ কিসের জন্য অথচ কাহার জন্য কবিতার খসড়া করা
কবিতায় ছন্দ বাঁধা, কবিতায় দগ্ধ হওয়া—?
সিংহাসন তুচ্ছ করে কবিতারই জন্য শুধু কেন বারবার
রিগ্রেডের অন্ধকারে—ভয়ংকর অন্ধকারে—
পিস্তলের মুখে বুক পেতে দেয় গোপনে সরোজ ?
নিরীক্ষা অনেক হল, কারুকার্য আন্দোলন প্রভৃত দেখলাম,
অসংখ্য বিশেষ্য দিয়ে কবিতায় পদালেখা প্রভৃত দেখলাম,
'কল্লোল' মিলিয়ে গেছে, 'কবিতা' এলিয়ে গেছে,
কৃত্তিবাসও মিথ্যে, প্রবঞ্চক।
এই যে তারপদবাবু কোথায় যাচ্ছেন ?
একদা ওভারটুনে কবিতার জয়োৎসবে আপনারা, দেখেছি,
সুন্দরী মহিলা দেখে, পেট বুক রা কিংবা প্যাডের পুলকে
যতখানি পুলকিত

তারও চেয়ে ঢের ম্লান কবিতার দুঃখকষ্টে
কবিতার রক্তক্ষয়ে
কবিতার অপবিত্রতায়।

আসলে, তেমন কোনো ইদানিং কবিতা লিখিনি
আসলে, তেমন কোনো ইদানিং মহিলা দেখিনি
আসলে, তেমন কোনো পুরুষালী বলাৎকারও এখনো ঘটেনি
আসলে, তেমন কিছু প্রতিপাদ্য এখনো হল না
কবিরা সবাই প্রায় পদ্য লিখে পদ্যের কাগজ থেকে
একে একে দক্ষশুক্র বিদগ্ধ হয়েছে।

কার কাছে প্রশ্ন করি শেষ পৃথিবীর কাছে দিয়ে যেতে
মুক্তোর মতন কিছু সর্বশেষ উজ্জ্বল কবিতা—
আমার বক্ষের রক্তে রঙ্ যার অন্তিম করুণ,
আমার বক্ষের দুঃখে শব্দ যার রামায়ণী—সর্বলোক মুখে,
আমার বক্ষের প্রেমে ভেজা হিমে হাজার মানুষী
সিক্ত হয়, সন্তান প্রসব করে?

পবিত্র অক্ষর নিয়ে চতুর্দিকে ইদানিং অশুচি শব্দের ভিড়।

অক্ষম জারজ দুঃখে কবিতার মাঠঘাট অপবিত্র করেছেন
—এর বিরুদ্ধে সাহসী যুবতী প্রয়োজন।
সাহসী যুবতী বড় প্রয়োজন
যেহেতু কবিতা থেকে দুঃখ কষ্ট ভালোবাসা রক্তপাত
বাদ দিয়ে কবিতা কবিতা করা—
নির্মস্তিষ্ক মহিলার ঢালাও শরীর নিয়ে
প্যাড কিংবা ব্রা সর্বস্ব আবক্ষ জানুর মধ্যে মধ্যরাত্রে তালমাতাল—
ইহাই কবিতা।
পবিত্র অক্ষর নিয়ে চতুর্দিকে ইদানিং হত্যাকাণ্ড, বলাৎকার,
অশুচি শব্দের বড় ভিড়।
কি নিয়ে কবিতা লিখব, কবিতার দুঃখকষ্ট, রক্তপাত—
রক্তপাতে ভেসে যায় মানুষের মুখ ভেসে যায় মানুষীর মুখ
অতঃপর এই ভেবে কবিতা লিখিনা ইদানিং।
শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
সন্তানের অসহায় ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে
এখন সহায় খুঁজি—
কবিতা লিখিনা আর—

সুকুমার ঘোষ

শাপভ্রষ্ট

মফঃসলে লীলা সেরে শাপভ্রষ্ট কলকাতা নরকে
ফিরে যাচ্ছি। কদমে কদমে ধায় বিপুল বাহন;
সাপটা করে গ্রাসে ভরে মাঝে মাঝে কাহন কাহন
জীবন্ত খড়ের বোড়ে, আবার উগলেও দেয়। শোকে
অথবা উল্লাসে বুঝি, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ছোটে
সঙ্গী হাওয়া, কিম্বা বাঁক নিয়ে পিছু-হটা দেয়ালের
ভোটের পোস্টারে গিয়ে থেতলে যায়। বিগত কালের
নিহত নেত্রীর মুখ সেই শব্দে বুঝি চমকে ওঠে।

জানি না কখন আমি ঝাঁপ দিতে ছুটে আসা পথ
তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিই জানলা দিয়ে ওপাশের মোড়ে—
যেখানে অলক্ষ্যে কেউ কাটা পড়া দিনগুলো জোড়ে;
কিন্তু একই নির্বিকার ছুটে যাচ্ছে মাতাল এ রথ।
সহসা চমক ভাঙে, উঁকি দিচ্ছে উপকণ্ঠে রোগা
চাঁদ যেন, বুয়ারি ট্যাক্ষের গায়ে, আবগারী দারোগা।

এই পৃথিবীর মঞ্চে

সবুজ রঙকে আমার
সব সময়
তরল মনে হয়
আর তরল মনে হয়
লাল রঙকে।

গাছের পাতার সবুজ রক্ত
যতোই শুকিয়ে থাকুক
সবুজ পাতা সর্বদাই আর্দ্র
গাছভাঁত লাল ফুলের
তলা দিয়ে যেতে গেলে ভয় হয়
পাছে ওদের টকটকে রক্তে ভিজে যাই
সাদা রঙকে যেমন নিরেট মনে হয়

নীল রঙকে যেমন পাতলা পর্দার মতো মনে হয়
হলুদ রঙকে যেমন উষর মনে হয়
সবুজ আর লাল তেমন নয়

এই পৃথিবীর মঞ্চে
আমি যে ভূমিকাতেই অভিনয় করি
আমার হাতে রক্ত
আর মুখের উপর সবুজ পিচকিরি

স্বপ্ন

ঈশ্বর, যৌবনে তুমি যে স্বপ্ন পাঠাও
দেখি তার হৃদয় পাথর হয়ে আছে ;
চোখ বোঁজা—তোমার নির্দেশ ভুলে পাছে
দৃশ্যান্তরে ছুটে যায়, ছোট্ট মাথাটাও
আমার বুকের ওমে আস্তে আস্তে গলে
চুল বেয়ে ধারা ওই পাতাল গঙ্গার।
শিথিল বাহুর আর শীতল জল্পার
কল্লোল থিতিয়ে আছে তলার পল্বলে।

একদিন শেষ হবে এ-সব সাধনা,
তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠবে স্বপ্নও সহসা,
তখন কী করে তাকে একথা বোঝাব
একদা আমারও প্রাণে ছিল উন্মাদনা ;
সে যদি না মানে এটা প্রতীক্ষারই দশা
আমিও স্বপ্নের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাব।

অভিরূপ সরকার

কুয়োতলা

ফাল্গুন চূর্ণ হয়ে গেছে। সেই দম্পতি যারা
সারারাত ভালোবেসেছিলো এখন তারাও আর নেই।
আছে জনহীন কুয়োতলা, ভাঙা কুঁজো, শীতল উনুন।
তবু অন্য এক অমোঘ ফাল্গুন বিপুল তরঙ্গ হয়ে

এসেছে আবার। এলো অমল-ধবল মেঘ,
আমের মুকুল, হাওয়া কতদিন ঘরের ভিতরে
দিগন্ত বর্ণনা করেছে। তার অমিত গৌরব
আমাদের রিক্ত, ভীরু দম্পতি-হৃদয়ে ক্রমে উপনীত।

গৌতম বসু

দেবী পারুলিয়া

ছায়ার সারাংশে সে নেই, অগ্নিসাজ
পড়ে আছে ; তার কেশভার দেখার
স্পর্ধা হয় না, ফিরে চলি, পথে গরুর কঙ্কাল

হয়তো সে নৌকা প্রসব করেছে
এমন নৌকা, অস্থিময়,
টিলার উপরে বালকদের খেলা থেমে আসে।

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেডুসার মাথা : ১

আমার আঙুল ওকে তিনভাগে বেঁকিয়ে, বিভক্ত ক'রে, মুঠোয় এনেছে, যাতে ওর মায়া কেটে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়, ম'রে যায় একেবারে। তৃতীয় গুচ্ছের মুখে এখনও অল্প নেশা লেগে।—এবার কি আমি ওকে ঠোঁটে তুলে নেবো, নাকি ও আমার গলা-জড়ানোর নাম ক'রে লুকিয়ে কামড়ে ধরবে সিঁথি ?

আর অমনি, ঘুরে ঘুরে শেষবারের মতো তিনভাগ এক হয়ে ঝ'রে যেতে দিলো কিছু চূর্ণ চুল।

ওর শেষ রক্তপাত—ঘুমোতে যাওয়ার আগে, সন্ধ্যাবারান্দায়।

সাতাশি

মেডুসার মাথা ঃ ২

আগের দু'জন উড়ে চ'লে গেছে
ওরা পরী ছিলো।
কিন্নরী আর ডাইনির ঠিক
মাঝখানে আমি
এই সরু তারে দুলতে দুলতে
ছাতা মুড়ে ফেলে
একা দাঁড়িয়েছি বিপজ্জনক

তোমার পকেটে আয়নাটুকরো,
রূপ বাঁধা আছে!
মুখোশে তীব্র নীল রোদকাচ—
কে তোমায় এতো
বর্মে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে
রণক্ষেত্রে ?
তাঁবুতে আমার রাত ফেটে পড়ে

রতিকাঁটা সারাগায়ে শিউরোয়
এই কালো মুখ
হাতআয়নায় দেখবো না আর
কুনজর দেবো
তোমার দিকেই, পাথরকুচির
মতো তোমাকেও
ছুঁড়ে ফেলে দেবো রাতের নদীতে

দুইপলকের নিচে কেঁপে ওঠে
আগুনের শিখা
জল ও বাতাস দুত ব'য়ে হায়—
তবুও কি আমি
শূন্যের থেকে দু'চোখ নামিয়ে
তাকাতে পাবো না
তোমার শরীরে, আর কোনোদিন ?

সগর মৈত্র

হয়তো বাতাস জানে

রক্তমেঘ আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি ঝরে
সৈকতে মানুষ নেই, গরু চরে শুধু
যদিও গরুদের জীবনে সাগরের নুন-গন্ধ নেই
বনেদী ঝালর ঝোলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে
ঈশ্বরের বিকল্প হিসেবে কয়েকটি কবন্ধ
ঝালরের আড়ালে পাশার ছকে
চোখ রাখে, উফীষে চোরাই জরির ঝিকমিক্
বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত সপ্রতিভ ইঁদুরেরা
যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় আহ্লাদে অবাধে
তবে কি সবাই সুখী অথবা সে-ই একমাত্র চেনে নিজস্ব সুখের খোঁয়াড়
শারীরিক ঘনফলে প্রতিটি ইঞ্চিতে যার স্বেচ্ছাচারী বিষ

জলের মাছের চোখ দিয়ে স্থল নিরীক্ষণ শেষে
ঘোমটা টেনে ব্যক্তিগত বনবাসে চলে যায়
সেই অতৃপ্ত মাতালেরা
দৌড়বাজ ঘোড়ার মত সিকি-পথ মাত্র দৌড়ে
পুনশ্চ পৃষ্ঠ প্রদর্শন ছায়ার মত আশ্রয় চায় ছায়ার ভেতরে
অথচ বাতাস ভাসিয়ে নেয়
পাথরের টুকরোর মত অমসৃণ বর্ণমালা
আছড়ে পড়ে পাথরের প্রাচীরে
তবে কি বাতাস জানে, একমাত্র বাতাসই জানে
ওপারে অফুরন্ত আলোর সুতো, নির্মল ঘুড়ির ওড়াউড়ি

তিমির দেব

অসময়ে

মরচে রঙা শুকনো গাছের ডালে
উঠলো গেয়ে হলুদবরন ল্যাজ ঝোলা এক পাখী…

পুকুর তলে পড়লো কেবল দীর্ঘ প্রতিবিম্ব !

জ্যোৎস্না তখন ছিলো অনেক দূরে…

উননব্বই

সমীরণ রায়

সূত্র

রহস্য আছে, তাই আনন্দও আছে। যদি বলি, রহস্যেরই পোষাকী নাম আনন্দ, তো খুব ভুল হয়ে যাবে ? ধরো এই বহুপৃথিবী ও মায়াপৃথিবীর সমস্ত রহস্য হঠাৎ আমাদের জানা হয়ে গেছে, কিছুই নেই আর অজ্ঞাত, তখন ? তখন চক্র-আয়নার দিকে তাকালে দেখবে, কোথাও হিল্লোলের সৌন্দর্য নেই, মানুষ ও সমস্ত জীব যেন বধির হয়ে গেছে ; কেননা তাদের জীবনে কৌতূহলের আগুনে দগ্ধ হওয়ার আর কোনো অবকাশ নেই. নেই অনাবিষ্কৃতের রহস্যউন্মোচনের চিরকালীন সেই আনন্দ ; কেননা তাদের জীবনে আর কিছুই গোপন রহস্য নয়, সব কিছুই তাদের জানা হয়ে গেছে।
অতএব প্রিয়, ধ্রুব প্রয়োজনীয় এই উপপাদ্যের শেষে সিদ্ধান্ত হিসাবে দ্রুত এই সূত্র আমি পাই : 'আনন্দের একক=রহস্যেরই একক।'

কিউপিড

আমাকে প্রণাম করো, করো আরাধনা
আমিই কিউপিড, সন্তান অ্যাফ্রোদিতির
প্রেমাস্ত্র, পুষ্পশর ও পুষ্পধনু শুধুমাত্র আমার-ই অধিকারে আছে

যদি আমাকে বিরক্ত করো, করো অবজ্ঞা
যদি আমি রুষ্ট হই গাঢ়ভাবে, তবে হে পূর্ণ বসন্তের নারী ও পুরুষদল
জেনো, তোমাদের জীবনে প্রেমের অপার শূন্যতা আসবে নেমে,
সূর্যদেব অ্যাপেলোর মতো তোমরাও বিরহের তীব্র দহনজ্বালায় ক্রমশ দগ্ধ হবে

সুতপা সেনগুপ্ত

লুম্বিনী সিরিজ

১.
খেলার আসরে নেমে কেন তুমি হঠাৎ পিছোলে
বাঁশির শব্দে যেমন বড়ায়ি অতীতশিলায় লিখে গিয়েছেন
শ্রীমতীর কথা তেমনি আমার ইতিহাস লিখে নেবে কোন্
জানোয়ার জন্তুর মতো শরীর ছুঁয়েছি জন্তুর মতো
হাঁটু গেড়ে ব'সে হাঁটু গেড়ে ব'সে হাঁটু তুমি আর

অজ্ঞাতবাস

এসো না কখনো চাঁদের আলোয় আমি ভেসে যাবো
বিষণ্ণ ছাদে ইস্পাতঘেরা বনভূমি
আমি ভালোবাসি তাকে লোকে যদি বলে পাগলা গারদ
তাতে ক্ষতি নেই আমি ইস্পাত
মাঝে মাঝে তবু নরম পলির জমি হয়ে যাই বাঘের থাবায়
জোছনার মতো চক্‌চক্ ক'রে হিংস্র দেখাই
তাতে ক্ষতি নেই শুধু খেলা হলে পিছোতে জানি না
কারখানা ঘরে লোহালক্কড় এলে আমি
শুধু জ্বালাতেই জানি গলিত লোহার উপদ্রবেও
তাতে ক্ষতি নেই শুধু ইস্পাত
গড়তেই জানি গড়তেই আমি তাতে ক্ষতি নেই
না হয় শিল্পী হতে পারবো না তাতে ক্ষতি নেই
না হয় তাতেই শিল্পী ক্ষতি হতে পারা নেই
খেলার আসরে কেন তুমি আর লোহালক্কড়
নেই !

২.
জঙ্ঘার নিচে ছিলো মন্দির
আমি তাতে ফুল উপচার নিয়ে হৃদপিণ্ডের অর্ঘ্য দিলাম
থালা ভরে ছিলো চাঁদের মতো
কলঙ্ক আর রক্তের স্তর তবু তুমি চোখ ফিরিয়ে নিতেই
হাজার চোখের দেবতা আমার পাষাণ হলাম পাষাণ হলাম
তুমি কাঁদলে না রসের ধারা নামলো তোমার ইন্দ্রিয়মূলে
জানতে পারিনি আমি তো পাষাণ চোখ নেই
কোনো কান নেই কোনো গান নেই শুধু পাষাণের মেয়ে পাষাণী হলি
এই আগমনী চোখে চোখে আর সহস্র চোখে
সহস্র বলি
কামনা করিনি চাই নি কখনো
তবু ভক্তই নামালে নিচে কাঁপালে নিচে
হাজার ঢাকের কাঁপনে তোমার জঙ্ঘার ভাঁড় ঘন হয়ে এলো
ঘষে ঘষে গেল
হাজার চোখের কামনা তোমার দেবীকে ঘিরে
পাষাণ হয়েও এই জ্ঞানঘট ছুঁয়ে বসে আছি বোধনের লোভে
জঙ্ঘার নিচে দেবীকে ডেকেছি নিজের ভেতরে

ছিলো মন্দির··· আমি তাতে ফুল···উপচার তুমি

একানব্বই

অরুণ বসু

ঝড়

অনুশোচনার রাত্রে আমি মানুষকে অবিশ্বাস করেছিলাম
এ আমার অনুতাপ
বিবাহের রাত্রে আমি মানুষকে ভালবাসতে শিখেছিলাম
এ আমার মুক্তি
গণমুক্তিসংগ্রামের রাত্রে আমি মানুষকে ভাই ব'লে জেনেছিলাম
এ আমার আনন্দ
আপোষহীন যুদ্ধে যে-কোনো স্বাধীনচেতা কবির মৃত্যুদণ্ডের রাত্রে
আমি মানুষকে জীবনের প্রতীক ব'লে মনে করেছিলাম
এ আমার গর্ব
পৃথিবীর দিকে-দিকে বন্দী ও নিরস্ত্র মানুষের মুক্তির সদম্ভ ঘোষণাকে
আমি পবিত্র-যুদ্ধ ব'লে মনে-মনে শ্রদ্ধা করি
এ আমার অহঙ্কার
আর আজ, ভারতবর্ষকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবাসি ব'লে
নতুন প্রজন্মের হাতে সুনিশ্চিত রাইফেল তুলে দিতে চাই
এ আমার দুঃসাহস, ঝড়, এ আমার মহাসনদ

মা ভূমি

মাটির স্বদেশ-ভূমি, দুবাহু তুলেছি আমি মাটির সম্মুখে

মাটি তো মায়ের মতো, আমি তার কোলে মাথা রেখে
জন্মজন্মান্তর বেঁচে থাকতে চাই

সুবর্ণ-রোদ্দুর আজ আমাদের বুকের ভিতরে ওই আমূল-পৃথিবী
খেলা করে, নাচে, গায়, আর্দ্র বাংলাভাষায় আপ্লুত, কথা বলে ;
আমি এই রক্তমাংসময় শুভ্র ভাষার ভিতরে শুয়ে চাঁদ দেখি
সমুদ্রের কাছে গিয়ে নতজানু, জানায় প্রণতি, বুকে ছুঁয়ে
সন্তানের জন্যে আমি স্বপ্ন ভেঙে গ'ড়ে তুলি ধূ-ধূ দূর নীল, নীলাকাশ
প্রেমিকাকে আলতো আদরে ডাকি, ওষ্ঠে চুমু দিয়ে বলি :
'ভালো আছো, আভূমি উজ্জ্বল তুমি, বনহংসী, অনন্তপ্রতিমা ?'—

এভাবেই দিন যায়, আর গ্রন্থাগারের ভিতরে এক জাতীয়তাবোধ
নৃত্যছন্দ আঙুল তুলে পৃথিবীকে কাছে ডাকে, বলে :
'মাটি তো মায়ের মতো, আমি তার কোলে মাথা রেখে
জন্মজন্মান্তর বেঁচে থাকতে চাই'—

মাটির স্বদেশ-ভূমি, দুবাহু তুলেছি আমি মাটির সম্মুখে

রহস্যের অন্ধকারে, একা

বসন্তমালতী আজ ফুটে আছে বাবুদের বাড়ির বাগানে

চিঠি কি পেয়েছো তুমি খরগোশের,
হরিণের,
উদ্‌বিড়ালের ?
পিক্‌নিক্ হয়েছিলো গতশীতে, মনে পড়ে,
শেষ সেন-রাজাদের গ্রামে
ছিলোনা অঙ্কতা, কিন্তু অরণ্যের নীলে এই পৃথিবীর নীল
যে-কোনো শহর আজ রহস্যের মতো মনে হয়
জানি এই রহস্যের অন্ধকারে, একা
ওই গ্রাম্যবালিকাটি বইখাতা বিছিয়ে দাওয়ায়
লাল-লণ্ঠনের ম্লান আলো মেখে ঘুমিয়ে পড়েছে
মা তার গিয়েছে বুঝি দূর বনে, কাঠ-কুটো কুড়োতে ?
কেন ফেরেনি এখনো ?
এখানে পৌঁছোয়নি তার বিদ্যুতের, শালের খুঁটিতে—
লালমাটি কাঁকর মেশানো, ধূ-ধূ দূর
ভাঙা শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে চ'লে গ্যাছে বুনোরাস্তা
বাঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপের জটলা ভেঙে, কুমোরপাড়ার দিকে সোজা—
দুপুরের ঘুঘুডাক ছিঁড়ে দ্যায় নিস্তব্ধতা—
দুপুরের বাতাসে কি নিস্তব্ধতা ওড়ে ?
পাল্কি চ'ড়ে বৌ আসে ময়রাদের নতুন উঠোনে
কম্পিউটার কথা বলে, রোবট খবর বলে, কবিতাও বলে
নদীর মুণ্ডু ধ'রে নদী-মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়
নদীকে শাসন করা হয়, তবু
খরা আসে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, বন্যা, ধ্বংস, ভূমিকম্প…
তীব্র ক্ষুধায় আজ বেঁকে যায় মানুষের টানটান শিরদাঁড়া—

তিরানব্বই

দুমড়ে-মুচড়ে বেঁকে যায়—তবু কিন্তু মানুষ বাঁকে না, আর তাই
এসবই ভূমিকামাত্র, উপসংহারের দৃশ্যে
এ-মাটিরই নীলস্বপ্ন নরম, মায়াবী
চিঠি কি পেয়েছো তুমি খরগোশের,
হরিণের,
উদ্‌বিড়ালের ?

রক্তমাংসের খাঁজ

পাকুড় স্টেশান থেকে নেমে আমরা একটা টাঙা নিলাম
আশুবাবু এর আগে অনেকবারই এসেছেন
আমি কয়ারি দেখবো ব'লে খানিকটা ধকল সহ্য ক'রেই
এখানে, এই পাথুরে আকাশের নিচে এসে চোখ মেললাম

বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে পাথুরে পাহাড়
চার্জ করা হয়
যারা পাথর কাটে তাদের চেহারাও পাথর খোদাই
এরকম পাথর খোদাই জীবন্ত মানুষ আমি
খুবই কম দেখেছি

(শ্রমিকের রক্তে এখানে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়)

শ্রমিকের রক্তে এখানে মহাভারতের পৃষ্ঠা জ্ব'লে ঝ'রে পড়ে আগুন

বাতাস বইলে এখানে পাথরের সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগে
আমরা বাতাসে ভেসে বেড়াবার আগে দেখলাম
অনেক বুনোফুল, প্রাসাদ, ইরিগেশন বাংলো ও ভিখারি
আর খাঁটি দুধের অবাধ বাণিজ্য বসতি

অনেক নিচে, পাহাড়ের গভীর গভীরতর খাদে
শরীরের পেলব খাঁজের মতো শুয়ে থাকা, খান্‌খান্ প্রজাপতি
শ্রমিক-যুবকের সাথে শ্রমিক-যুবতী
আমাদের চোখ নেমে চ'লে গ্যালো প্রজাপতির মতো
পাহাড়ি-প্রজাতির গায়ের গন্ধের দিকে, খাঁজের দিকে

এরকম রক্তমাংসের সুন্দর খাঁজ, আমি কখনো দেখিনি আর

আমি, দয়াময় ও একটি গুম্ফা

সমুদ্র ও পাহাড়ের নিথর-মাঝখানে, দয়াময়, নক্ষত্র ও শালীধানের আলোয়, হেসে উঠেছিলো অমল জ্যোৎস্নার মতো একবার এবং একবারই।

মৃত্যু, যা জীবনের চলচ্ছবি : নিরভিমান মানুষ কাঠগোলার পাশে ব'সে, ভাবে সম্মুখে জঙ্গল। ভাবে, পাথরের স্তূপ-জলছবির পাশে, এই-তো পর্বতমালা। ভাবে, বদ্ধ-ডোবার কালো জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে, এই-তো সমুদ্র। ভাবে, এরকমই অনেক কিছু—যা জীবন ও মৃত্যুর মাঝখান থেকে ক্রমশঃ উঠে আসে—কিন্তু, যা জীবন ও মৃত্যুর কোনো লোকায়ত স্থিরচিত্র বহন করেনা।

শুধু, গুম্ফার পাশে বসলে, গোটা বিশ্বকে আমার বধির ও মৃত্যুর মতো, জীবনের মতো, দ্রুত ও স্খলিত যৌনতার মতো অনুরণনময় ব'লে মনে হয়।

সমুদ্র ও পাহাড়ের নিথর-মাঝখানে, দয়াময়, নক্ষত্র ও শালীধানের আলোয় যেরকম হেসে উঠেছিলো অমল জ্যোৎস্নায়—সেরকমই কোনো দূর পাহাড়ের গুম্ফার বাতাবরণের পাশে, নিজের মৃত্যুদৃশ্য দেখলে, শিউরে উঠতে হয়, আনন্দে—মৃত্যু ও জীবনের মতো, যৌনতার মতো, স্খলিত ও দ্রুতহরিণীর মতো যা নিথর, নিষ্পন্দ, নিরপরাধ। এবং

আজো, কালো পোশাক পরা আমাকে, মধ্যরাত্রে, মাঝে-মাঝে বদ্ধভূমির দিকে হেঁটে যেতে দেখি, অবিরল, হেঁটে যেতে দেখি, বদ্ধভূমির দিকে অবিরল···